প্রিয়া ও দেবতা

সুপ্রিয় সোম

উপহার

প্রিয়া ও দেবতা

—অঙ্গরাগ—

কথা—সুপ্রিয় সোম

জ্যোতি—ব্রজমোহন দাস

রেখা—বিজয়রায় চৌধুরী

স্থিতি—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

বছর দুই আগে সলিল ডেরী-অন্-শোনে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিল। কিছুকাল সেখানে থাকার পর যখন পল্লীর জল বাতাসকে সঙ্গী করে তার সময় কাট্‌তে চাইল না, তেমনি দিনে তার সঙ্গী হ'ল একটী মেয়ের ভীরু নয়নের চাহনি। মুহূর্ত্তের জন্য সে বোধ করি খুব সচেতন ছিল না, তা না হ'লে সে তার সমস্ত মনকে চোখের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে অমন বিহ্বলের মত রেখার দিকে চেয়ে থাকতে পারত না। যখন রেখা সেই দৃষ্টির কাছে মাথা নত করে চলে গেল, তখন সলিলের মনে হল যে সে প্রতিমা দেখেনি, দেখেছে কেবল সচল সজীব নারী। সৌন্দর্য্য রেখার আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মনের ভেতরে এতটুকু অপবিত্র ভাব জাগিয়ে তোলে না, সে সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ নিজের করে নিয়ে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করবার বাসনা জাগে না, জাগে

কেবল সেই সৌন্দর্য্যের প্রতিমাকে সুমুখে রেখে যুগ-যুগান্তর ধরে পূজা করবার একটা নিদারুণ ইচ্ছা। এরই কয়েকদিন পরে যখন রেখা আর তার দাদা নির্ম্মলের সঙ্গে সলিলের পরিচয় হল, তখন সলিল সে পরিচিত অবস্থায় সেখানে বেশী দিন থাকলে না, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিছানাপত্র নিয়ে রেখা ও নির্ম্মলকে বিস্ময়ে অভিভূত করে কলকাতায় ফিরে এল। রেখা একটী কথাও বল্লে না, সলিলের মুখেও ভাষা কিছু বেরোল না, কেবল ট্রেন ছেড়ে দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উভয়ের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কলকাতায় নির্ম্মলও যখন তার বোনকে নিয়ে ফিরে এল, তখন এই ছেলেটীকে সে খুঁজে বের করে নিলে। এদের পরিচয়—যার প্রারম্ভ হয়েছিল শোন নদীর ধারে, তাকে এত শীঘ্র পরিসমাপ্তি করতে নির্ম্মলের ইচ্ছা করেনি। সলিলকে তার বড় ভাল লেগেছিল। তার সংযত ব্যবহার, মিষ্ট কথাবার্ত্তা, শিক্ষিত মন নির্ম্মলকে বড় আকৃষ্ট করেছিল। এখন সে যখন সলিলকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল, তখন সলিলকে সে আর এমনি ছেড়ে দিলে না, তাকে এমন ভাবে নিজেদের করে নিলে যেন তার নির্ম্মলের বাড়ীতে একটা অধিকার আছে। রেখার

সঙ্গে সলিলের দূরত্বভাব বহুদিন হল খসে পড়ে গেছে, এখন উভয়ের মৌখিক আলাপও হয় যথেষ্ট।

নির্ম্মল ছিল ইঞ্জিনিয়ার, অবশ্য নামে, কাজে মোটেই নয়। দিন তার কাট্‌ত পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে। মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কীয় নানা কাজে তাকে বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতে হ'ত বাইরে, ভেতরের খবর অনেক সময়ই সে পেত না, সেখানে রেখাই ছিল সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সলিল অনেক সময়ই আসে, কোন সময় নির্ম্মলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কোন সময় হয় না, রেখাই অতিথি পরিচর্য্যা করে। একদিন সলিল আপত্তি তুল্‌লে যে সে কোনমতেই রেখার সঙ্গে একলা গল্প গুজব করবে না লোকচক্ষে এটা খারাপ দেখায়, নির্ম্মলেরও নানারূপ সন্দেহ হতে পারে।

রেখা হেসে বল্লে, দাদা তোমার কাছে আমাকে রেখে গেলেই সব চেয়ে নিরাপদ ভাববে, তোমার অত ভয় করতে হবে না।

সলিলও হাসলে। হেসে বল্লে, আজ হয়ত' এই প্রকাণ্ড পুরীর ভেতরে আমার কাছে তোমাকে রেখে যেতে তিনি আপত্তি করচেন না, কিন্তু কাল ত' তাঁর এ ধারণা বদ্‌লে যেতেও পারে।

মানুষ যে কত সময়ে কত ক্ষুদ্র কারণে লোককে

বিশ্বাস করে, আবার তেমনি ততোধিক ক্ষুদ্র কারণে তাকেই অবিশ্বাস করে, তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না।

রেখা মাথা নাড়লে, হেসে বল্লে, দাদা লোক চিনতে পারে।

সামান্য একটু গম্ভীর হয়ে সলিল বল্লে, লোক চেনা কি অত সহজ কাজ মনে কর? তুমি চিনতে পার?

দাদার চেয়ে আমি চিনতে পারি। লোক চিনতে মেয়েরা যত পারে, ছেলেরা তত পারে না, এই তোমায় বলে দিলুম।

সলিল হেসে ফেল্‌লে, বল্লে, বলত' আমি কেমনধারা লোক?

ভণ্ড, বদমাইস, চরিত্রহীন, লম্পট, এক নিঃশ্বেসে রেখা কথাগুলো বলে হাসতে লাগ্‌ল।

এত খবর এর মধ্যে তোমায় দিলে কে? সলিল প্রশ্ন করলে।

জেনেছি মশাই, জেনেছি। তোমাকে সব তাই বলে বল্‌তে হবে নাকি?

সলিল স্মিতমুখে বসে রইল। উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করে থাক্‌বার পর রেখা চোখে করুণতা মিশিয়ে মুখে কোমল ভাব এনে বল্লে, তুমি অমন অদ্ভুতের মত

ওখান থেকে চলে এলে কেন বলত? ভেবেছিলে বুঝি আমার কাছ থেকে চলে এলেই আমাকে ভুল্‌তে পার্‌বে?

সলিল সামান্য একটু হেসে উত্তর দিলে, বাস্তবিকই ভুল হয়েছিল।. তবে আমি চলে এলুম এই ভেবে, যে তোমার আমার মিলন হয়ত' হবে না, আর আমার মনের ভাব জানাই বা কী করে?

জানাবার আর কী কসুর করেছিলে। বলে রেখা হাসলে।

মুখের কথায় যে সব ভালবাসা প্রকাশ হয়, তার অধিকাংশই হয় মেকী। সত্যকারের ভালবাসার প্রকাশ হয় অতি সামান্য দু'একটা কথায়, অতি ক্ষুদ্র আচরণে। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এ কথা ত' আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু বান্ধব কত লোকেই না কত সময়ে বলে, কিন্তু তার ভেতরে ক'টা সত্যি হয়? সলিল একটা দিনও একটা কথা মুখ ফুটে রেখাকে বলেনি, রেখাও সলিলকে এড়িয়ে চলতো। অথচ দু'জনেই বুঝেছিল দু'জনের ভেতরে বোধ হয় একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠ্‌ছে।

রেখা হেসে বল্লে, জানাবার আর কী কসুর করেছিলে?

সলিল বোধ করি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল,

বাধা দিয়ে রেখা বল্লে, তুমি কাল্কে সকাল বেলায় একবার আসবে ?

সলিল বল্লে, কেন ?

সব খোঁজের তোমার দরকার কী ? আস্তে বলছি আসবে, আর কোন কথা নয়, বুঝ্লে ?

পরের দিন ছিল ১লা বৈশাখ। সলিল আসতেই রেখা সাদা গরদের কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে দেবীর বেশে অতি মৃদু হাসতে হাসতে তাকে নিয়ে পূজোর ঘরে চলে এল, সলিল নির্ম্মলের খবর জিজ্ঞাসা করাতে রেখা উত্তর দিলে, দাদা এখন ঘুমুচ্চে, আটটা না বাজলে কি দাদা কোনদিন ঘুম থেকে ওঠে ?

পূজোর ঘরে সলিলকে রেখা এনে ফেলেছিল। সে বড় বিস্ময় অনুভব করলে, কী মতলব বলত ?

বল্ব না। বলে হাসতে হাসতে রেখা একটা রজনী-গন্ধা ফুলের মালা হাতে করে তুললে। সলিল লক্ষ্য করলে, রেখার হাতটা সামান্য একটু কেঁপে উঠল, মুখ চোখও যেন একটু রাঙা হয়ে এল। তবু কাছে এগিয়ে এসে সলিলের গলায় মালাটা ফেলে দিতে যাবে, এমন সময় সলিল পেছিয়ে এসে বল্লে, এর মানে ?

রেখা মাথা নীচু করে বল্লে, তোমাকে আজ—

বুঝেছি; কিন্তু 'পরিণীতা' পড়েছ ত'? যে ভুল ললিতা করেছিল, সেই ভুলই রেখা যেন না করে।

রেখা কিন্তু শুন্‌লে না...

সলিল নির্ম্মলের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীতে এসে এই কথাটাই তার বারে বারে মনে হতে লাগ্‌ল যে, তার এই নিষ্কলুষ প্রেমে বোধ হয় কোথায় কিছু দোষ থেকে যাচ্ছে। নির্ম্মল তাকে বিশ্বাস করেছিল, সেই বিশ্বাস সে হারাচ্ছে না ত'? কিন্তু প্রেম যখন হয় তখন ত' সকলকে জানিয়ে হয় না, গোপনে তার অভিষেক হয়! এতে দোষেরই বা শ্রুত থাক্‌তে পারে কী!

সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে সলিল রেখার কাছে এল, হাতে একটী লাল গোলাপ ফুল। ফুলটী রেখার হাতে দিতে গিয়ে কেমন ভাবে সেটা রেখার শ্বেত সুন্দর পায়ের ওপরে এসে পড়্‌ল। রেখা সামান্য একটু চমকে সরে যেতেই সলিল বল্লে, ভুল হতে চলেছিল, তাই বোধ হয় প্রকৃতি আপনি সংশোধন করে দিলে।

দেখে মনে হল, রেখা কথাটার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌তে পারলে না। একটু পরে ধীরে ধীরে ফুলটা কুড়িয়ে নিলে।

সলিল এই ফুলটা রেখাকে দিয়েছিল, পূজারী যে উদ্দেশ্যে প্রতিমাকে ফুল দেয় সেই হিসেবে। সলিলের রেখাকে বুকে বেঁধে ফেল্‌তেও ইচ্ছে করে, আবার তাকে কাছে বসিয়ে সাজাতেও ইচ্ছে করে, সলিলের কাছে রেখা একধারে প্রিয়া ও অন্যধারে দেবী।

দুই

এদের এই গোপন মিলন নির্ম্মলের চোখে বড় একটা পড়েনি, পড়লেও সে এটাকে গ্রাহ্য করত' না, এমনিতর শিশুর মত সরল তার মন। আর এটাও সে বেশ জানত সলিলের দ্বারা আর যাই হোক, তার কোনও অনিষ্ট হবে না। কিন্তু সেদিন বাড়ীর বুড়ো সরকার নির্ম্মলকে বল্লে, বাড়ীতে দিদিমণি সর্ব্বদাই একা থাকেন, সেই সময় সলিলবাবুর খুব ঘন ঘন যাতায়াত ভাল দেখায় না।

অনেক কালের সরকার এইটী। এর কথাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। নির্ম্মল চমকে উঠে বল্লে, কেন, কী হয়েছে? সলিল কি——

বাধা দিয়ে সরকার বল্লে, না বাবু, তা কিছু নয়; তবে এমনি বল্লুম।

নির্ম্মল আর যাই হোক বোকা ছিল না। বুঝ্লে, তার অনুপস্থিতিতে সলিল বড় বেশী এখানে যাতায়াত করে, এবং হয়তো রেখার সঙ্গে এমন সমস্ত আলোচনা করে যা তার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। রেখার বয়েস হ'ল আজ প্রায় একুশ বছর। পাঁচবচ্ছর বয়েস থেকে

নির্ম্মল রেখাকে গড়ে তুলেছে। বাপ অনেক আগেই গিয়েছিলেন, মাও যেদিন মারা গেলেন সেদিন নির্ম্মলের হাতে ছোট বোনটীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে তারা গড়ে উঠতে লাগ্‌ল একবৃন্তে দুটী ফুলের মত। রেখা জান্‌ত আমার দাদা আছে; নির্ম্মল জান্‌ত আমার রেখা আছে। উভয়ের ভালবাসা ছিল অতি গভীর, কোনদিন কোন কারণে উভয়ের মধ্যে এতটুকু মনোমালিন্য হয়নি। রেখা দাদাকে শ্রদ্ধা করতও প্রচুর, দাদার কোন কথা কোনদিন অবহেলা করেনি, সে জান্‌তো তার দাদা বাপের চেয়ে অধিক। নির্ম্মল বিয়ে করেনি এই ভয়ে, পাছে বউ এসে দুই ভাই বোনের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধানের সৃষ্টি করে বসে। নির্ম্মলের তাই প্রতিজ্ঞা ছিল সে বোনের বিয়ে দিয়ে তবে নিজে বিয়ে করবে। এমনি ভাবে যাকে মানুষ করে তুলেছে, যে বোনকে সে এত ভালবাসে, তার এতটুকু অনিষ্টের সম্ভাবনা নির্ম্মলকে পাগল করে তুললে, সে এ সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে উঠ্‌ল।

নিজের প্রতি নির্ম্মলের ভাবান্তর সলিল লক্ষ্য করলে, কিন্তু কারণ বুঝতে পারলে না।

সলিল যে চুরী করে আসত তা নয়, তবে মাঝে মাঝে এমন হয়ে যেত, নির্ম্মল অনুপস্থিত, একা রেখাই আছে।

অথচ নির্ম্মল না আসা পর্য্যন্ত কোনদিন সলিল চলে যায়নি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্ম্মল এসেছে ততক্ষণ সে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে।

সেদিনও যখন সলিল এলো নির্ম্মল নেই। রেখা সলিলকে নিয়ে ওপরের বস্‌বার ঘরে গেল। রেখা হেসে বল্লে, তোমার দিনদিন বড় সাহস বেড়ে যাচ্চে, না? দাদা না থাক্‌লেই তোমার বুঝি এখানে আস্‌বার জন্যে পায়ে সুড়-সুড়ি লাগে।

স্থিরভাবে গম্ভীরকণ্ঠে সলিল উত্তর দিলে, বেশ, আর আসবো না।

বাঃ, তাই বলেচি নাকি? তুমি একটুও ঠাট্টা বোঝ না। রাগ হল ত'?

হলেই বা আর তোমার কী?

বেশ, যত পার রাগ করগে। এখন যা বল্‌চি শোন। কী কর্‌বে ঠিক কর্‌লে?

একটু চুপ করে থেকে সলিল উত্তর দিলে, কী কর্‌ব এইটেই ত' এ যুগের মস্ত বড় সমস্যা। চাকরী জোটে না, ব্যবসায়ের টাকা নেই, শিক্ষা নেই। অথচ কিছু যে শীগ্‌গির কর্‌তে হবে এও ত' বেশ বুঝতে পারচি।

সলিল এম্, এ পাশ করেছিল তার মামা জীবিত

থাক্‌তে থাক্‌তেই। তাদের বাড়ীতেই সে মানুষ হয়েছিল। বাপ মা অতি ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন, এক কপর্দ্দকও রেখে যান্‌নি। আর তার কেউ ছিলও না। যেদিন তার জ্ঞান হল, সেদিন সে দেখলে পরের বাড়ীতে ঘৃণায় মাখা দয়া মেশানো ভাত গিলতে তার গলায় বাধে, সে মামার বাড়ী ত্যাগ কর্‌বে। ছেলে পড়িয়ে, ক্যান-ভাসিং করে, একটু আধটু খবরের কাগজে লিখে, যাহোক করে নিজের পড়ার ও খাওয়া-থাকার খরচ নিজে চালিয়ে নিয়ে এল্। আজও সে থাকে মেসে। মাঝে শরীর অসুস্থ হওয়াতে কম টাকার মধ্যে সে শোন নদীর তীরে বেড়িয়ে এল, সেইখানেই হল তার এদের সঙ্গে পরিচয় এবং রেখার সঙ্গে যেদিন তার ভালবাসার বিনিময় হয়ে গেল সেদিন সে বুঝতে পার্‌লে তাকে এইবার বোধ করি একটা কিছু কর্‌তে হবে।

তুমিত' এম্, এ পাশ করেচ, একটা প্রফেসারি যোগাড় করে নিতে পার না?

সেকেণ্ড ক্লাস এম্, এ-র আবার দাম কী? তাই ত' বলেছিলুম গলায় মালা দিও না, এখন কী কর্‌বে, বলে সলিল হাসলে।

রেখাও হাসলে, হেসে বল্লে, ফিরিয়ে দাও।

কোথায়, গলায় ? তাহলে ত’ আরও বাঁধা পড়বে !

রেখা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লে, বাঁধন যারা কাটে তারা যত শক্ত বাঁধনই হোক, সে কাটবেই। বাইরের জিনিষের আবার মূল্য কী ?

রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ঠিক এম্‌নি সময় সাহেবী পোষাক পরে নির্ম্মল এসে ঢুকল, সঙ্গে তার একটী যুবক ও আর একটী মেয়ে। নির্ম্মল সলিলকে উদ্দেশ করে বল্লে, সলিল যে, কতক্ষণ বসে আছ ? বস, আমি আসচি, বলে ভেতরে চলে গেল।

কাপড় জামা ছেড়ে এসে নির্ম্মল একটা সিগারেট ধরিয়ে সলিলকে বল্লে, আমার মাসতুত ভাই আর বোনকে নিয়ে এলুম, বাড়ীটাতে বড় এক্‌লা এক্‌লা ঠেকে।

সলিল সস্মিত মুখে বল্লে, এতবড় বাড়ী, এই কটী লোক, এক্‌লা এক্‌লা ঠেকবেই ত’।

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে নির্ম্মল বল্লে, আমি বড় ঝামেলা সহ্য করতে পারি না, তবে রেখার জন্যে ওদের নিয়ে এলুম, একা থাকে।

শেষের দিকটায় নির্ম্মল বেশ জোর দিয়ে বল্লে। সলিল বুদ্ধিমান, বুঝলে তার সান্নিধ্য রেখার পক্ষে বিষময় হতে পারে এই ভেবেই নির্ম্মলদা’র এই সতর্কতা। আগের

ভাবান্তরও সে লক্ষ্য করেছিল, দু' একটা কথায় নির্ম্মলও তাকে ইঙ্গিত করেছিল যে তার সঙ্গে রেখার সে রকম মেলামেশা নির্ম্মল পছন্দ করে না। সলিল চেষ্টা কর্‌ত না-আসতে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারে কখন চলে আসতো তা সে নিজে জান্‌ত না। বহুদিন এই নির্লজ্জতাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে, আর সে দেবেনা, কিছুতেই না।

মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করে সলিল বল্লে, উঠি নির্ম্মল-দা।

সামান্য একটু হেসে নির্ম্মল বল্লে, দিনরাত এখানে ওখানে ঘুরে না বেড়িয়ে কাজ কর্ম্মের একটা চেষ্টা দেখো না। ছেলেমানুষ, শিক্ষা আছে, তোমরা ত' অনেক কিছুই কর্‌তে পার! করে তার পর নাহোক অন্য যত সস্তা জিনিষে মাথা ঘামিয়ো।

সলিল কিছু না বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

তিন

নূতন অতিথি যারা এল তাদের পরিচয়ের একটু আবশ্যকতা আছে। রেখার মাস্‌তত বোন রেখার চেয়ে পাঁচ ব'ছরের ছোট। স্কুলে কখন পড়েনি, বাড়ীতে বসেই পড়াশোনা করে। মাসীকে বুঝিয়ে নির্ম্মল নীহারকে নিয়ে এল, বলে এল, রেখা নীহারকে হু'দিনে মৈত্রেয়ী কি গার্গী করে তুল্‌বে, অতএব ওর পড়াশোনার জন্যে বিশেষ কিছু তাঁর ভাবতে হবে না। নীহার আস্‌বে দেখে প্রথম নম্বরের ভবঘুরে নীহারের বড় ভাই বীরেশ বল্লে, চল দাদা, তোমাদের বাড়ী বহুকাল যাইনি, একটু ঘুরে আসা যাক্। নির্ম্মল দেখ্‌লে ভালই হল, যত লোক আসে ততই ভাল।

কিন্তু যে জন্যে এদের নিয়ে আসা হল, তার বিশেষ কোনও ফল হল না। নীহার রেখার কাছে বড় একটা থাকেই না, লুকিয়ে লুকিয়ে বাছা বাছা উপন্যাস পড়ে। রেখা পাঠ্য পুস্তক পড়তে বল্লে বলে, দিদি, তোমাদের বাড়ীতে এসেচি কি কেবল মুখ ভার করে যত সব হতচ্ছাড়া অঙ্ক করতে না ইতিহাস মুখস্থ করতে। ওরকম করলে দিদি, আমার থাকা হবে না বলে দিচ্চি।

অতএব রেখার কাছে সে একটুও থাকে না। সে চাকরকে দিয়ে যত সব অপাঠ্য কুপাঠ্য উপন্যাস নিয়ে এসে পড়ে; পাছে রেখা দেখে ফেলে এই ভয়ে তাকে এড়িয়েই চলে। রেখা বড়লোকের মেয়ে, আছে অগাধ ঐশ্বর্য্য, কিন্তু কোন দিন সে নিজেকে আধুনিক ভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে সস্তা করে তোলেনি বা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি। নীহার সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ে। বাড়ীতে থাক্‌তে যে সব সুখ সুবিধে তার হোত না, এখানে এসে তার মনের ভেতরের নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধে করে নিলে। নির্ম্মল বা রেখা তার বিরুদ্ধে এতটুকু আপত্তি করেনি, তাদের দুটী ভাই বোনের শিক্ষা ছিল এত সুন্দর!

নীহার বলে, দিদি, তোমাদের এত আছে, তোমরা তবু এমন ভাবে থাক কেন?

রেখা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করে, কী রকম ভাবে থাক্‌তে হবে!

উপন্যাস-দুরন্ত নীহার বলে, কেন, যে রকম ভাবে আজকালকার মেয়েরা থাকে তেমনি থাক। দেখ্‌চ না, সমস্ত জগতে একটা পরিবর্ত্তন এসেচে; যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেছে, মেয়েরা হয়েচে স্বাধীন……

বাধা দিয়ে রেখা বলে, থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না, ক' কুড়ি সস্তা উপন্যাস পড়লি ?

নীহার হেসে বলে, পড়েচি অনেক, পড়ে পড়ে মনে হচ্ছে কী করে কেমন ভাবে সেই সমস্ত আমার জীবনে খাটাব।

রেখা হেসে বলে, তখনই হবে ট্রাজেডীর সুরু। পড়চ পড়, কিন্তু উপন্যাসকে জীবনে খাটাতে যেও না, জীবনটাকে নষ্ট করবার জন্যে।

তুমি যে কী বল !

নীহার রাগ করে চলে যায়। রেখা হাসে। ভাবে, কত ছেলে মেয়ে জীবনটাকে ভেবে নেয় একটা দীর্ঘ উপন্যাস, এবং এই ভাবাতেই কত ছেলে মেয়ের সর্ব্বনাশ ঘটে ওঠে।

বীরেশ অদ্ভুত রকমের ছেলে। সে ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিল, আই, এ-তে প্রথম। কিন্তু বি, এ, আর পড়েনি, বলে বসল, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করতে পারে না, সে নিজে বই নির্ব্বাচন করে পড়বে, সকলকে পড়াবে, দু'দিনে তার দেশটাকে ভয়ানক রকমের শিক্ষিত করে তুলবে, নূতন ভাবধারায় সমস্ত দেশটাকে একেবারে ওলট-পালট করে দেবে।

সে দিনরাত বই পড়ে, দিনরাত চা খায়, দিনরাত সিগারেট পোড়ায়। অনেক সময় নির্ম্মলের সিগারেটের টিন উধাও হয়ে যায়; নির্ম্মল সিগারেট চাইলে হেসে বলে, দাদা, সিগারেট না ধরালে আমার যেন কেমন মাথা খেলে না। তোমার আর বেশী সিগারেট খাবার দরকার কী, মাথার কাজ ত' আর এতটুকু করতে হয় না!

নির্ম্মল হেসে বলে, বলিস কী? মাথার কাজ যত তোর একারই, না?

তা নয় ত' আর কী? বলে টেবিলটায় দারুণ এক ঘুষি মারলে। বল্লে, বাপ রেখে গিয়েছিল অগাধ টাকা, জীবনের পথ সুগম হয়ে গেল, করে খেতে হল না, মাথা ঘামাতে হল না, আজ দিল্লী, কাল সিমলা করে বেড়াও, মাথাটা কতটুকু ঘামাতে হয় শুনি?

বীরেশ নির্ম্মলের চেয়ে অনেক ছোট হলেও নির্ম্মল বীরেশের বিদ্যা বুদ্ধিকে যথেষ্ট খাতির করে। তার সঙ্গে তর্ক ত' করে উঠতেই পারে না, বরং যা বলে অনেক সময় মেনে নেয়।

নির্ম্মলের সুমুখেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বীরেশ বল্লে, বুঝতুম একটা ভাল লাইব্রেরী করেচ, তাহলেও বুঝতুম একটা কাজ করলে। কেন তুমি একটা ভাল

লাইব্রেরী করতে পার না ? নিজে পড় না পড়, কিন্তু যারা পড়তে চায়, তাদের একটু সাহায্য কর না। নূতন নূতন ভাব নিয়ে এস, নূতন আইডিয়া, নূতন রকমের লোকের গড়ে ওঠ্‌বার প্রয়োজন হয়েচে।

রেখা এধার দিয়ে যাচ্ছিল, চীৎকার শুনে হেসে বল্লে, বীরেশদা'র কি এবার বক্তৃতা সুরু হল ? কিন্তু তুমি দাদার সুমুখে সিগারেট খাচ্চ কী বলে ?

বীরেশ লাফিয়ে উঠ্‌ল। যা কিছু পুরাতন সে তা' বিধ্বস্ত করতে চায়। পূর্ব্বের রীতি নীতি সমস্ত আমূল পরিবর্ত্তন করবার জন্যে তার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু সদা জাগ্রত। বলে উঠ্‌ল, দাদার সুমুখে সিগারেট খাচ্চি, কি বাবার সুমুখে সিগারেট খাচ্চি ওসব নিয়ে বিশেষ আমি মাথা ঘামাতে চাই না। দিন কতক পরে হয়ত' বল্‌বে গুরুজনের সুমুখে ভাত খেতে পাব না। আব্‌দার সব ধরলেই হল। লোককে মানব কেন ? আমি মানতে রাজী শুধু তাকেই যার আছে ভাল ব্রেন, নূতন আইডিয়া। আচ্ছা আমি ফেলে দিচ্চি, তুই নিতান্ত বল্‌লি, নির্ম্মলদা কী ভাববে, তাই!

নির্ম্মল হেসে বল্লে, না, না, আমি কিছু ভাব্‌ব না, তুই যত পারিস খা'।

আর খাব কী দাদা, ফুরিয়ে এসেচে, বলে শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রের ভেতরে ফেলে দিলে।

রেখা হাসলে, বল্লে, ও, তাই হটাৎ বুঝি ভ্রাতৃভক্তি বেড়ে উঠ্‌ল।

চার

অতএব যে জন্যে এদের নিয়ে আসা হল তার বিশেষ কিছুই ফল হল না। একজন থাকৃত উপন্যাস আর প্রসাধনে ব্যস্ত আর একজন থাকৃত নূতন নূতন আইডিয়া নিয়ে, বই, খবরের কাগজ, আর মাসিক পত্রিকার ভেতরে ডুবে। রেখাকে একলা কাটাতেই হত, সলিল এলে যথেচ্ছ পূর্ব্বের মতই তার সঙ্গে আলাপ করবার কোনও অসুবিধা হত না। কিন্তু সলিল আজ বহুদিন হল আসেনা। দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে রেখা সলিলের কথাই ভাবছিল এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে সলিল এসেচে।

রেখা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে এল, দেখলে, সলিলের চেহারার সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে। আগের চেয়ে সে কালো হয়ে গেছে, রোগাও কম হয় নি।

রেখা উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করলে! তুমি এতদিন আসনি যে?

সময় করে উঠ্‌তে পারি নি।

বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

না, বস্‌ব না, আমি একটু ব্যস্ত আছি। আজ তোমার কাছে একটা জিনিষ চেয়ে নিতে এসেচি, দেবে ?

রেখা হেসে ফেলে বল্লে, কী জিনিষ, আমাকে নয়ত' ?

কথাটা বলেই রেখা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সলিল এটা লক্ষ্য করে বল্লে, না, তোমাকে পাবার মত দুরাশা আমার নেই, তবে তোমার একটী সুন্দর ফটো দেখেচি তোমার ঘরে, সেইটে আমার চাই।

ফটো নিয়ে কী করবে ? আমি মরে গেলে তুলে নিও, তার আগে পাবে না।

রেখার কথাটা বোধ হয় সলিলকে একটু ব্যথা দিলে। এটা বুঝতে পেরে রেখা সলিলের মুখের দিকে চেয়ে বেশ হাল্কাসুরে বল্লে, আমি থাক্‌তে তোমার ফটোর কী দরকার বল ? আর আমি যে তোমার আগে মরব না, এ নিশ্চিত।

ফটো নিয়ে আমি কী করব এ প্রশ্ন তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তোমার কাছে চাইচি, দিতে পার ত' দাও।

না, দোব না। দাদা যদি জিজ্ঞাসা করে ফটোটা কী করলি, তখন কী বলবো ?

ঠিক এমন সময়ে নির্ম্মলের পায়ের শব্দ বাইরে শোনা

গেল। নির্ম্মল ঘরের ভেতরে ঢুকে বল্লে, এই যে সলিল এসেচ।

কথাটার ভেতরে একটু শ্লেষ ছিল, তা সলিল লক্ষ্য করলে। সে উত্তর দেবার আগেই রেখা বল্লে, দাদা, তোমার যে আজ এত দেরী হল ?

কারণ বলে নির্ম্মল রেখাকে বললে, ওরা কোথায় ? বীরেশ বাড়ী আছে ?

রেখা জানালে, আছে ; নির্ম্মল ভেতরে চলে গিয়ে শোফায় শুয়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো, দু'জন লোককে নিয়ে এলুম, কিন্তু দু'জনেই দু'রকমের। সাধারণ ভাবে যেমন মেলা-মেশা করে থাকতে হয় তা এরা মোটেই নয় অথচ সলিল ঠিক গোপনে রেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাচ্চে, কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্চে না। বড় রাগ হল তার নীহারের ওপরে। নীহারকে ডেকে পাঠাতে সে এসে বল্লে, দাদা, আমায় ডাকচো ?

হ্যাঁ, করছিলি কী ?

পড়ছিলাম।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মলের চোখে পড়লো নীহারের হাতে একখানা বই, তার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'প্রেম-পিপাসা'।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্ম্মল বল্লে, বেশী পড়ে শরীর খারাপ করিস নি, তোকে ত' আর পাশ করতে হবে না, অত ভয় কী ?

নীহার চলে গেলে নির্ম্মল স্তম্ভিত হয়ে গেল, ভাবলে, নীহার যেন রেখার সঙ্গে নাই মেশে।

সলিল চলে গেলে পর দাদার কাছে রেখা এসে দাঁড়াল, বল্লে, দাদা তুমি শুয়ে পড়লে যে।

আজ অনেক ঘুরতে হয়েচে। একটু চুপ করে থেকে পরে বল্লে, হ্যাঁরে, সলিল চলে গেছে ?

গেছে।

ছেলেটীকে আগে আমার বড় ভাল লেগেছিল, কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা নয় ?

রেখা ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করলে, কী ?

তুই ওসব বুঝবি না। তোর যদি অত বুদ্ধি-সুদ্ধিই থাকবে তাহলে আর ভাববার দরকার কী ছিল। বলেই নির্ম্মল উঠে চলে গেল। রেখা চুপটী করে বসে রইল, বুঝতে পারলে না ঠিক ব্যাপারটী কোথায় দাঁড়িয়েছে, তবে আব্ছায়ার মত কতকটা বুঝতে পারছে।

নির্ম্মল তার বোনকে অত্যন্ত ছেলেমানুষই জানে। সে যে কখন কাউকে ভালবাসতে পারে, কারু সঙ্গে প্রেম

বিনিময় করতে পারে নির্ম্মল এ ধারণা করতে অক্ষম। সে জানে, যে রেখাকে তার মা তার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়ে ছিলেন, রেখা ঠিক সেই রকমই আছে ; কি দেহে কি মনে কোন দিকেই তার এতটুকু বৃদ্ধি হয়নি। রেখা ও সলিলের কথাবার্ত্তা আজ সে নিজে কাণে শুনেছে। তার ধারণা হয়েছে, সলিল রেখাকে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে উপভোগ করাই হচ্ছে তার ইচ্ছে। রেখার কোনও দোষ নেই, থাকতেও পারে না। এমনিতর নির্ম্মলের অন্ধ ভগ্নী-স্নেহ!

পাঁচ

উত্তর কলিকাতার একটা পল্লী।

এই পল্লীর ভেতরে মণীষাদের বাড়ীটাই ছিল সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু। রোজ সকালে সন্ধ্যায় বাড়ীটাতে চায়ের আসর জমে উঠত, পাড়ার অনেক কলেজ-পড়ুয়া ছেলেই সেখানে সমবেত হয়ে রাজনীতি থেকে নারীহরণ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের গল্পই বাকী রাখত না। অনেক সময় সেখানে যে সমস্ত গল্প গুজব হত, তা' সাহিত্যে লেখবার মত নয়, তবে বোধ করি একদিন এক ঘণ্টা কোন ছেলে সেখানে বসে থাক্‌লে নারীদেহের সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞানই নিয়ে আসবে।

মণীষা শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী। যখন এই বাড়ীর তলায় চায়ের আসর জমে উঠ্‌ত, ঠিক এই সময় বারন্দার ওপরে মণীষার বই পড়্‌বার ইচ্ছেটা জেগে উঠ্‌ত। বারান্দায় হেলে দাঁড়িয়ে এলোমেলো চুলগুলোয় কাণ দুটী ঢেকে কিংবা কোনদিন সর্পিল বেণী আনিতম্ব ঝুলিয়ে বইয়ের পাতায় মন দেবার ভান করত। কোনো কোনো দিন দেখা যেত সকালবেলায় উঠে বারান্দায় ইজি-

চেয়ারটা টেনে এনে সুমুখের রাস্তার দিকে কিংবা বিপরীত বাড়ীর অধ্যয়ন নিরত কোনো ছেলের দিকে চেয়ে দেখ্‌ত। কলেজ থেকে ফেরবার সময় যে ভাবে সে চলে, দেখলে মনে হয়, সে ছুনিয়াকে চোখ রাঙিয়ে চলে। কাউকে গ্রাহ্য করবার সে প্রয়োজন মনে করে না, সেই যেন ছুনিয়ায় একা আছে সচল, সবল, সজীব আর সমস্ত নিশ্চল, নিষ্প্রাণ।

নীচে যে আসর জম্‌ত, সেখানে মণীষার অবারিত গতিবিধি ছিল, তার মেজদা কোনোও আপত্তি করত' না। এই আসরের প্রধান পাণ্ডা ছিল রাজা। রাজার চেহারাও যেমন ছিল অসাধারণ সুন্দর, অর্থও ছিল তেমনি প্রচুর। সে রোজ মোটরবাইকে করে দূর থেকে এই পল্লীতে আসৃত, মণীষার মেজদা অনেক কালের বন্ধু বলে। রাজার বাড়ীর ভেতরে যাবারও নিষেধ কোন ছিলনা, এমন কি মণীষার শয়ন-কক্ষ পর্য্যন্ত তার বাধা-হীন গতি। মণীষার বিধবা মা এ বিষয়ে বড় খেয়াল করতেন না, শোকে তাপে জর-জর বলেই বোধ হয়।

সলিল এই পল্লীতে বাস করলেও এবং মণীষাদের আত্মীয় হলেও এ বাড়ীতে সে বড় বেশী যাতায়াত করত' না, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গেও মিশ্‌ত কম। তবু তার

বুদ্ধি. সংযত আচরণ, স্নেহ-কোমল মুখ তাকে অত্যন্ত লোকপ্রিয় করে তুলেছিল।

মণীষার মেজদা খুব বড় একটা মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করে। একটা কাজ খালি হয়েছে শুনে এবং তার সঠিক বিবরণ জান্‌বার জন্যে সলিল সেদিন সন্ধ্যা-বেলায় মণীষাদের বাড়ীর ভেতর এসে ডাক্‌লে, মেজদা?

মেজদা সলিলের চেয়ে এক বছরের বড় থাকাতে সলিল মেজ-দাকে মেজদা বলেই ডাক্‌ত।

মণীষার মাকে সুমুখে দেখে সলিল জিজ্ঞাসা করলে, মাসিমা, মেজদা কোথায়?

এই ত' দেখলুম রাজার সঙ্গে গল্প করছিল, ওপরে আছে বোধ হয়। তোর কোন কাজের জোগাড় হল রে?

সেই চেষ্টাতেই ত' মেজদার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলুম। মাসখানেকের মধ্যে চাকরী না জুটলে উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নেই, এ ঠিক।

এই বলেই সলিল ওপরে উঠে এল। মেজদার ঘরের পাশেই মণীষার ঘর। মেজদার ঘরে যেতে হলে মণীষার ঘর পার হয়ে যেতে হয়।

মণীষার ঘরের কাছে এসেই সলিলের বাক্‌রোধ হয়ে

গেল। দেখলে, ঘরের ভেতরে রাজা মণীষাকে বুকের ওপরে টেনে নিয়ে এসে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। মণি বলে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী একটা ভেবে আর কিছু না বলে হন্ হন্ করে নীচে নেমে এল।

মণীষার মা জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা পেলি রে?

না, বোধ হয় বেরিয়ে গেছে। মণীষার মা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন সলিলের মুখ এত অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।

রাজা তখনও মণীষাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

মণীষা বল্লে, কে আসচে, না?

কই, কোথায়? অত ভয় কিসের?

না—না, ছাড়, এখুনি কে এসে পড়বে। মেজদা ত' এখুনি আসচে বলে গেল। বলে রাজাকে প্রায় একরকম জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে মণীষা মাথার চুলগুলো ও বেশবাস একটু ঠিক করে নিলে।

কিছুক্ষণ পরে মা যখন ওপরে এলেন তখন দেখলেন, মণীষা ও রাজা তুমুল তর্ক তুলেছে।

রাত্রে যখন সলিল মেসে ফিরে এল, তখন তার খাওয়া-দাওয়ার রুচি একেবারে গেছে। সমস্ত বুক জুড়ে একটা ঘোরতর বিতৃষ্ণা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠে তার দেহ

ও মন বিষাক্ত করে তুলচে। এই শিক্ষা, এই আধুনিকতা, এই দায়িত্বহীন মা ভাই, প্রত্যেকের ওপরে তার অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সেই বা কী! যে দোষে আজ সে রাজাকে ও মণীষাকে দোষী সাব্যস্ত করচে, নির্ম্মল কি তাকে সেই দোষে অভিযুক্ত করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে বিচার করতে হলে শুধু ত' তার কাজকে নিয়ে বিচার করা যায় না, তার আচরণ দেখে, তার মনের অভিসন্ধি দেখেও বিচার করতে হয়। বিয়ে করবার আগে সে কি ভাবতে পারে রেখাকে বুকের ওপর টেনে আলিঙ্গন করতে! সেও শিউরে উঠল, ভাবলে, এই ভাবাতেই বুঝি সে একটা মস্ত বড় দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেচে। যারা শুধু মেয়েদের কাম-প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধনের উপায়স্বরূপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, সে তাদের দলে নয়, সে রেখার ভেতর দিয়ে উচ্চতর জীবনে উঠতে চায়, যে রেখার ভেতরে ঐহিক ও ঐশ্বরিক মিলে গেছে।

ছয়

সকাল হতেই সলিল মণীষাদের বাড়ীতে এসে হাজির হল। তখন সকাল ছ'টা অর্থাৎ মেজদার পক্ষে তখন নিশুতি রাত। বেলা আটটার আগে কোন দিনই মেজদাকে উঠ্‌তে দেখা যায়নি। সলিল হয়ত' মেজদাকে জাগাতো, কিন্তু সুমুখে মণীষা পড়ে যাওয়াতে তা' আর হয়ে উঠলো না।

মণীষা সকাল সকালই ওঠে। সে তখন সবেমাত্র তার ইজি-চেয়ারটা দরজায় টেনে এনে দুনিয়ার সঙ্গে বোঝা পড়া করে নেবার জন্যে বেরিয়েছে। পাশের বাড়ীর ছেলেটারও বি, এ, পরীক্ষার পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

মণীষা সলিলকে দেখেই বলে উঠলো, সলিল-দা এত সকাল সকাল যে! কাল ত' এসেছিলে শুন্‌লুম, কই আমার সঙ্গে দেখা করে গেলে না ত' ?

সলিল একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, হ্যাঁ, করতুম, তবে— বলে চুপ করে গেল।

মণীষা সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে কাউকে যদি ভক্তি,

বা শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে সে এই সলিল! মেজ-দাত' তার ইয়ার, সে তাকে গ্রাহ্যই করে না। আর মা যে তাকে ভয়ানক ভালবাসে এও তার অবিদিত নেই, যত দোষই করুক না কেন মণীষা, তার মা কিছুতেই শাসন করেন না, করতে জানেন না। সলিল হটাৎ চুপ করে যাওয়ায় তার পূর্ব্বসন্ধ্যার কথা মনে হল। কী বলবে ঠিক করতে পারছিল না, এমন সময় চাকর খবরের কাগজ দিয়ে গেল। মণীষার সকালে উঠেই খবরের কাগজ পড়বার অভ্যাস ছিল, চাকর আজও কাগজটা দিয়ে গেল। সলিল একখানা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে মণীষা সলিলকে বল্লে, শুনচো সলিল-দা, মেরী পিকফোর্ড যে ডগ্‌লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্‌কে ডিভোর্স্‌ করবার বন্দোবস্ত করচে।

সলিল মণীষার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে বল্লে, ওদের দেশে দাম্পত্য-জীবনের এর চাইতে বড় আদর্শ আর কী ধারণা করা যেতে পারে।

তার মানে, ওদের দেশে দাম্পত্য-জীবন সুখময় নয়?

নিশ্চয়ই না। সলিল কথাটা এত দৃঢ়ভাবে বল্লে যে মণীষা মুহূর্ত্তের জন্যে চমকে উঠ্‌ল। একটু সাম্‌লে বল্লে, তবে কোন দেশে দাম্পত্য-জীবন সুখময়? আমাদের

দেশে ? যেখানে পুরুষরা স্ত্রীদের ওপরে যথেচ্ছ অত্যাচার চালায় !

অত্যাচার সকল দেশেই কিছু কিছু আছে, আমাদের দেশেই শুধু নয় ।

কিন্তু ওদের দেশে এই অত্যাচার হতে আরম্ভ করলেই তারা পরস্পর বিবাহ-চুক্তি ভেঙে দেয়, এবং তারপরে আবার মনের মত লোকের সঙ্গে নূতন করে চুক্তি করে । এতে সুখটা ভোগ করা যায়, দাম্পত্য-জীবনে বেশীদিন কলহ আর অশান্তির সঙ্গে বাস্ করতে হয় না । আজ যদি আমাদের দেশে ডিভোর্স আইন পাশ হয় তাহ'লে প্রায় দেখা যাবে শতকরা নব্বইজন স্ত্রী তাদের স্বামীকে ত্যাগ করতে চাইবে । অবশ্য কোথাও কোথাও স্বামীও স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইবে ।

হ্যাঁ, আবার নূতন লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে, আবার কলহ হবে, আবার চুক্তি হবে, আবার বিয়ে হবে, তবুও এমনতর মনের মত লোক বা মেয়ে পাওয়া যাবে না যেখানে এই চুক্তি স্থায়ী হয় । বিবাহটা চুক্তি ব'লে যতদিন ভাবতে শিখবে ততদিন এ গোলমাল হবেই ।

মণীষা কাগজগুলো ভাঁজ করে রেখে বেশ সোজা হয়ে বসে বল্লে, তুমি স্থায়ীত্বের কথা বলচ কেন, ওটা ত'

ভূয়ো কথা, 'শেষপ্রশ্নে'র 'কমল' ত' ওটাকে একেবারে তুলেই দিয়েচে।

'কমল' তুলে দিলেই ত' আর সকলে তুলে দিতে পারবে না। ছেলেপিলে না হ'লে ডিভোর্স প্রথা কতকটা কার্য্যকরী হতে পারে, কিন্তু ছেলে-মেয়ে হলে ত' আর তা চলে না। স্ত্রী যখন ছেলেপিলে নিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করবে তখন সেগুলো মায়ের সঙ্গে যাবে, না বাপের সঙ্গে থাকবে। মায়ের সঙ্গে যদি যায়, তাহ'লে তার নূতন স্বামী নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে না, আর যদি বাপের সঙ্গেই থেকে যায় নূতন স্ত্রী আপত্তি তুলবে, না তুলে পারে না।

কিন্তু এই করেই ত' ওদের দেশ সুখে আছে।

সলিল হেসে বল্লে, তা থাকতে পারে, আমি ত' আর দেখে আসিনি।

মণীষা একটু রেগে বল্লে, কি, তুমি আমায় ঠাট্টা করচ বুঝি!

সলিল বল্লে, না ঠাট্টা করচি না, দেখচি তোমাদের সব ধারণা!

কেন, তারা সুখে নেই?

সুখে আছে বলে মনে হচ্ছে তোমার এই পাঁচ সাত

হাজার মাইল দূরে বসে, কিন্তু ওটা ত' সত্যি নাও হতে পারে !

কিন্তু 'কমলে'র এ কথা কি সত্যি নয় যে প্রয়োজনেও যে সমস্ত লোক বদ্‌লাতে পারে না তারা মরে গেছে।

প্রয়োজন বলতে গেলে তুমি কী বুঝচ ?

চাকর এসে ছ'পেয়ালা চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মণীষা বল্লে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর কলহ করে, তাদের এতটুকুও মনের মিল নেই, এ অবস্থায় তাদের পরস্পরের বিচ্ছেদই ভাল। এ অবস্থায় বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়েচে। আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথাকে সেই জন্যে বলেছে মৃত, সে প্রয়োজনেও বদ্‌লাতে পারে না।

কিন্তু মণি, তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করি, যদি এমন হয়, স্বামী চায় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে, স্ত্রী স্বামীকে চায় না, কিংবা স্ত্রী চায় স্বামীকে ত্যাগ করতে, স্বামী চায় না, তখন কী করা যাবে ?

এ রকম ঘটনা খুব অল্পই ঘটে থাকে।

মোটেই নয়, এই রকম ঘটনাই বেশী ঘটে। স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে হটাৎ তাকে বিয়ে করবার বাসনা তার মনের ভেতরে জেগে উঠল। পূর্ব্ব স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অজুহাত তিনি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু স্ত্রী

হয়ত' এই স্বামীকে আপ্রাণ ভালবেসেছে, সে কিছুতেই তার স্বামীকে ছাড়তে চায় না। ওদের দেশে এসব ঘটনা নিত্যই ঘটে।

বেশ, তাহলে তোমার মত কী? আমাদের দেশের সনাতন বিবাহ প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে?

বিবাহটাকে চুক্তি বলে ভাবলে চলবে না, এটাকে ভাবতে হবে একটা চিরজীবনের বন্ধন, একটা প্রকাণ্ড বড় দায়ীত্ব। পুরুষ মেয়ে এইরকম ধারা ভাবতে শিখ্‌বে। দেখ, মা লোকের একটা হয়, বাপও হয় একটা, স্ত্রী বা স্বামীও হবে একটা, তার বেশী নয়। স্ত্রী ও স্বামী বিয়ের বন্ধনে এক হয়ে যাবে।

কিন্তু বন্ধনে যে প্রাণ ক্ষীণ হয়ে আসে।

একটু হেসে সলিল বল্লে, সব সময়ে উপমা চলে না, মণি। বস্তুজগতে যা সত্যি, মনোজগতে তা নাও হতে পারে। রাজা কতকগুলো নিয়ম করে দেয়, সেই নিয়ম মেনে আমরা চলি। আমরা ত' বিদ্রোহ করতে পারি যে চুরী করতে না পেরে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসৃচি, অতএব আমাদের চুরী করবার স্বাধীনতা দেওয়া হক্। স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছচারিতা নয়। তোমাকে একটা গণ্ডী করে দেওয়া হবে, তার ভেতরেই তুমি স্বাধীন, তার বাইরে নয়।

বিয়ের গণ্ডীর ভেতরেও তুমি স্বাধীন, সেখানে তুমি স্বামীকে নিয়ে যা খুসী কর, কিন্তু স্বামী ত্যাগের কল্পনা কোরোনা, তাতে বড় ভাল হয় না।

মণীষা হেসে ফেলে বল্লে, সলিল-দা, তোমার সমস্ত তর্ক মেনে নিলেও একথা আমি বলতে বাধ্য হব, যে তুমি এই ছেলেমানুষ বয়সেও এত আধুনিকতা থেকে সরে গেছ কী করে?

আধুনিকতা মানে কি যা কিছু পুরাতন তাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন, কিংবা যা কিছু জীবনে মন্দ বলে ধরে নেওয়া যায় সেগুলিই গ্রহণ। কোনটা? .

কেন, ছেলেমেয়েদের মেলামেশাতেও তুমি দেখেচি অনেক সময় রাগ কর, কিন্তু সাধারণ মেলামেশাতে দোষ কী?

আমি ছেলেমেয়েদের মেলামেশাকে ভাল বলেই মনে করি, কোনদিনই খারাপ ভাবি না। খারাপ ভেবেচি অবাধ মেলামেশাকে, এই অবাধ মেলামেশা থেকে কী যে খারাপ হয় তা' আমাকে বলে বোঝাতে হবে না, নিজেই একদিন বুঝতে পারবে বলে আশা করি। যাক্, মেজদা উঠল কি না দেখিগে। বলে সলিল উঠে চলে গেল।

সাত

একদিন সন্ধ্যে বেলায় রেখার ঘরে থাকা অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল। নীহারের সঙ্গে একটু গল্প করার উদ্দেশে সে নীহারকে ডাকলে। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কোথায় গেল এই খোঁজে রেখা এধার ওধার খুঁজতে খুঁজতে ছাতে উঠে এল। বহুদিন সে ছাতে ওঠেনি; উন্মুক্ত বাতাস নিয়ে একটু হাঁপ্‌ ছাড়লে। বড় স্বস্তি বোধ করলে। ছাতটা ঘুরে একবার এসে সিঁড়ির ঘরের পাশে থাম্‌তেই দেখতে পেলে, নীহার একটা লাল কাগজে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে কী লিখ্‌চে! রেখার পদশব্দে চমকে উঠ্‌ল, বল্লে, কে, দিদি?

রেখা হেসে বল্লে, তুই কি অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাস্‌ যে এইখানে বসে বসে লিখ্‌চিস্‌? দেখি কী।

না দিদি, ও আমি তোমাকে দেখাতে পারব না ও তুমি দেখতে চেও না।

যদি না দিস্‌, তাহলে সকলকে কী বলে বেড়াব জানিস ত'?

কী বল্‌বে?

কী বল্‌ব, বলে রেখা হেসে একটু থেমে বল্লে, বলব যে তুই একটা ছেলেকে চিঠি লিখ্‌ছিলি।

বেশ করছিলুম, লিখছিলুম তাতে কী হয়েচে।

কী আর হবে, তুই একটা ছেলেকে ভালবাসিস এতে আর দোষ কী। তা আমাকে চিঠিটা একটু দেখা না ভাই, আমিও চিঠি লিখ্‌তে শিখে নিই।

তুমি কাউকে বলবে না ত'?

রেখা জানালে সে কাউকে বলবে না। এসব কথা প্রচার করে বেড়াবার জিনিষ নয়। চিঠিটা আত্মোপান্ত পড়ে রেখার সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা করে উঠ্‌ল। তার ভেতরে প্রেম বা ভালবাসার একটা কথাও আছে বলে ত' রেখার মনে হল না, আছে কেবল অতি অশ্লীল নোংরা মনোভাবের পরিচয়। চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে রেখা জিজ্ঞাসা করলে, তুই যে ছেলেটিকে ভালবাসিস্, সেও তোকে সেইরকমই ভালবাসে ত'?

নিশ্চয়ই, সে ভালবাসে না আবার। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কত চিঠি দিয়েচে।

ছেলেটা পাশের বাড়ীতে থাকে। রেখা বল্লে,

তোকে চিঠি দিয়েছিল বলেই যে তোকে ভালবেসেচে এর কী কোন মানে হয়।

নীহার কী একটু ভেবে বল্লে, সে সেদিন লুকিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, আমাকে কত জিনিষ দিয়ে গেল, আমাকে কত—

বল্‌তে বল্‌তে চুপ করে গেলি যে। বল্‌ না, আমার কাছে বল্লে তোর আর ভয় কী! আমি মেয়েমানুষ হয়ে দাদাদের কাছে বল্‌ব কী করে!

না, আমার লজ্জা করচে!

মেয়েমানুষের কাছে বুঝি বলতে লজ্জা করে, আমি হলে কিন্তু সব বলে দিতুম।

তুমি হাস্‌বেনা বা কাউকে বলবেনা ত'?

রেখা জানালে সে কিছুতেই হাস্‌বেনা বা কাউকে বলবেনা।

নীহার বল্লে, সে আমাকে কত চুমু খেয়েছিল দিদি!

চোদ্দ পনের বছর বয়সের মেয়ের মুখের এই নির্লজ্জ উক্তি রেখার সমস্ত শিরার রক্ত মাথায় ছুটিয়ে দিলে। রাগে আগুন হয়ে রেখা জিজ্ঞাসা কল্লে, আর কী করেছিলি বল্‌?

নীহার আর-কিছু কিছুতেই স্বীকার কল্লে না। রেখা বল্লে, তোরা উভয় উভয়কে ত' ভয়ানক ভাল-বাসিস দেখচি, তার চেয়ে এক কাজ কর্ না কেন?

কী!

ওকে বিয়ে কর্, আমি মাসিমাকে বলে দিই যে মেয়ে তার বর খুঁজে নিয়েচে।

না না, সে আমি করব না।

কেন না! চিঠি লেখবার বেলায়, এটা ওটা করবার বেলায় ত' ঠিক আছ!

তাতে আর কী হয়েচে, অমন্ ত' অনেকেই এ বয়েসে করে থাকে ধরা পড়লেই বুঝি যত দোষ।

রেখা স্তব্ধ হয়ে গেল। ভাবলে, এরই বা দোষ কী! এ ত' একটা বোকা পল্লীগ্রামের মেয়ে কল্‌কাতার জলে সবেমাত্র ফরসা হতে শিখেচে। কত শিক্ষিত নর নারী প্রথম যৌবনে মুখে পাউডার, রুমালে এসেন্স মাখার মত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালবাসা-বাসিটাকেও নিতান্ত খেলো করে ফেলেচে, দেহটাকে একটা অতি তুচ্ছ পণ্যদ্রব্যের মতই মনে করে, সে যে পবিত্রতার মন্দির, তা তারা ভুলে যায়। ক্ষুণ্নমনে সে নীচে নেমে এল।

নীচে নেমে এসে রেখা দেখ্‌লে নির্ম্মল আর বীরেশ তর্কের তরঙ্গ তুলেচে। আজ বুঝি নির্ম্মল রেখার জন্যে খুব একটা ভাল ছেলে দেখে এল সেই কথাই জানাতে এসে নির্ম্মলের বিপদ হয়েছে, বীরেশ জানুতে চায়, রেখার এর মধ্যে বিয়ে দেবার অর্থ কী।

নির্ম্মল বল্লে, আমার ছোট বোনটীর বিয়ে দোব না, সে সংসারী হবে না, চিরকাল সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে ?

চশমাটা চোখ থেকে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে বীরেশ বল্লে, অর্থাৎ ছোট বোনটীর তুমি সর্ব্বনাশ করতে চাও। কেন, ওকে ভাল ভাল বই কিনে দাও, নূতন: নূতন চিন্তা করতে শেখাও, দুর্ব্বল পঙ্গু জাত্‌টাকে গড়ে তোল্‌বার চিন্তায় মস্‌গুল হয়ে থাকুক্, ফুলশয্যার চেয়ে বইয়ের ওপরে ওর শয্যা পেতে দাও, দেখবে দাদা, তোমার রেখা বিশ্বের প্রেয়সী হয়ে উঠেচে ।

কী যে বকিস্ পাগলের মত!

টেবিলের ওপরে একটা ঘুঁসি মেরে বীরেশ বল্লে, আমি যে পাগলের মত বকৃচি এটা তুমি প্রমাণ কর। যা কিছু বল্‌বে, যা কিছু করবে, তার পেছনে

প্রমাণ চাই, চাই লজিক, চাই Sound Argument.

না বাপু, আমি লজিক-টজিক পড়িনি, সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোর মতে যদি সব মেয়েকে চল্‌তে হয়, তাহলে ত' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা প্রকাণ্ড মঠ হয়ে যাবে। আর দেশের লোকসংখ্যা থাক্‌বে কম্‌তে। আমাদের বাঙালী যে কী রকম হু-হু করে কমে যাচ্চে তার খবর রাখিস্ কি ?

বাঙালী কম্‌চে, অতএব কতকগুলো কেরাণীর জন্ম দিতে হবে, না! সবল সুস্থ highly intellectual বাঙালী গড়ে তুল্‌তে হবে, এবং একমাত্র তা' সম্ভব হবে test tube-এর দ্বারা। তাই যার তার সঙ্গে বিয়ে তুলে দিতে হবে, কিংবা বিয়েটা একেবারেই তুলে দিয়ে, ভালবাসা, প্রেম, কাম যত সব আবর্জ্জনা ছুঁড়ে ফেলে test tube-এর দ্বারা Superman গড়ে তুল্‌লেই মানুষ হবে সুখী। বুঝলে দাদা ? বুঝছ ত' ? বলে বীরেশ নির্ম্মলের হাতটা ধরে একটু নেড়ে দিলে।

তুই একটা পাগল, একটা ম্যানিয়াক, এসব কখন সত্যকারের জীবনে খাটে। তাহলে মানুষের মনটাকে আগাগোড়া পরিবর্ত্তন করে ফেলে দিতে হয়। তা'

যখন সম্ভব নয়, তখন চীৎকার করে লাভ নেই।

এমন সময় ঠাকুর এসে জানিয়ে গেল 'খাবার তৈরী। সেদিনকার মত বীরেশের বক্তৃতা ঐখানেই মুলতুবী হয়ে রইল।

আট

সলিল চলে গেলে পর মণীষার ধারণা হল সলিল নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করে, তা' না হলে এ কথা বল্‌বে কেন যে অবাধ মেলামেশা থেকে যে দোষ হয় তা' একদিন নিজেই বুঝতে পারবে। মুহূর্ত্তের জন্যে তার মনে হল সে কোনও দোষ করচে কি না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রাজার উন্নত চারুদর্শন চেহারা, তার মোটরবাইক, তার মিষ্টি কথা, তার থেকে তার সুমিষ্ট হাসি, তার এ চিন্তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে এসে মণীষা তার শোবার ঘরে শুয়ে পড়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে রে? অমন ভর সন্ধ্যে-বেলায় শুয়ে কেন?

মাথা ধরেচে, বলে মণীষা চুপ করে রইল। মণীষার মা আর কিছু না বলে নীচে রান্নাবান্নার তদ্বির করতে গেলেন।

একটু পরেই সমস্ত পল্লীটা মোটরবাইকের শব্দে

কাঁপাতে কাঁপাতে রাজা উপস্থিত হল। বাড়ীতে ঢুকৃতেই মণীষার মা বল্‌লেন, হ্যাঁ বাবা, বিশু এখনও ফিরল না কেন আজ? অন্যদিন ত' সাড়ে পাঁচটার সময়েই ফেরে।

মেজ-দার নাম বিশু বা বিশ্বনাথ।

রাজা কারণ বল্‌তে পারলে না। বাইরের ঘরে এসে দেখলে তখনও কেউ আসর জমাতে আসেনি। তাই আবার ফিরে এসে ওপরে উঠ্‌বে কি না উঠ্‌বে ভাবচে, এমন সময় মণীষার মা বল্লেন, যাও না বাবা ওপরে, মণীষা একাটী আছে। তার আবার মাথা ধরেচে আজ

কথা মুখ থেকে পড়তে না পড়তে রাজা মণীষার ঘরে এসে হাজির হল। ডাক্‌লে, মণী!

কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সাহস করে ঘরের ভেতরে এগিয়ে গিয়ে ডাক্‌লে, মণি, এখন কেমন আছ?

মণি এবারেও কোনও কথা না বলে গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল।

রাজা হয়ত' মুহূর্ত্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাম্‌লে নিতেও তার খুব বেশী দেরী

হল না। ধীরে ধীরে মণীষার পাশে এসে দাঁড়াল।

মণীষা অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় যখন একটু ক্লান্ত হয়ে এল, তখন তার মেজ-দার ঘরে এসে কাঁপড় জামা গুছোতে সুরু করে দিলে। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে এল। মণীষা যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর করে আছে, রাজা সেই গম্ভীর অথচ তরুণ মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে হেসে বল্লে, শুনলুম যে তোমার মাথা ধরেচে, অথচ দুষ্টুমির বেলায় ত' ষোলআনা। যাও, বিছানায় শুয়ে পড়গে।

মণীষা কোনও উত্তর দিলে না। পাশ কাটিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে একেবারে মার কাছে এসে দাঁড়াল, রাজাও পেছনে পেছনে ছুটল।

মণীষা মার কাছে এসে বল্লে, দেখ না মা, রাজাদা' কি রকম বিরক্ত করচে!

রাজাও বলে উঠল, আচ্ছা, বলুন ত' মা, মণির কি অন্যায়। ও আমার সঙ্গে কিছুতেই কথা কইচে না কেন?

মণীষার মা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, মণীষাকে উদ্দেশ করে বল্লেন, যা না মণি, রাজার গাড়ীতে করে

হাওয়া খেয়ে আয় না, মাথা ধরেছিল বল্‌ছিলি, সেরে যেতে পারে।

মণীষা হটাৎ লাফিয়ে উঠল। বল্লে, ঠিক হয়েচে রাজা-দা, তুমি যদি বেড়িয়ে নিয়ে এস, তাহলে তোমার সঙ্গে আলাপ রাখ্‌ব, নয়ত' চিরকালের মত আড়ি করে দেব।

রাজা-দা হেসে বল্লে, সব সইতে পারি, কিন্তু তুমি আড়ি করে দিলে আত্মহত্যা করে মরব।

মণীষা সেজেগুজে যখন রাজার পেছনে গিয়ে বস্‌ল, এমন সময় মেজ-দা আফিস থেকে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলে, তোরা কোথায় চল্‌লি, সিনেমায় নাকি রে?

মণীষা উত্তর দিলে, না, এমনি বেড়াতে।

রাজাকে উদ্দেশ করে মেজদা' বল্লে, ওহে, তাড়াতাড়ি ফিরো, আজকে অনেক প্রোগ্রাম আছে। মোটরবাইক মণীষার আঁচল ওড়াতে ওড়াতে বেরিয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল জ্যোৎস্নারাত্রি। অনেক ঘুরে ঘুরে শেষে তারা কোথায় একটু বস্‌বে- ঠিক করতে পারলে না।

মণীষা বল্লে, চল, ভিক্টোরিয়া-হলের বাগানে যাই।

সে ত' এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

দেশবন্ধু পার্কে ?

অতি বিশ্রী জায়গা।

তবে চল 'লেকে' যাই। রাজা এতে স্বীকৃত হল।

'লেকে'র' ধারে দু'জনে বসে বসে কত মেঘদূত, কত শকুন্তলা রচনা করে ফেল্‌তে লাগলো, তার আর ঠিক নেই। এক সময়ে রাজা বলে উঠলো, কি সুন্দর স্বচ্ছ নীল আকাশ!

মণীষা হেসে ফেল্লে। বল্লে, তার উপর মলয় বাতাস, কোকিলের গান, দীঘিকার জলের পত্‌ পত্‌ শব্দ। কিন্তু আমি ত' পাশে বসে আছি, তবুও বিরহের হাঁফ উঠ্‌চে কেন!

তুমি বড় বেরসিক।

কিন্তু রসরাজ, আমার কথাতেই রস উঠ্‌ল উথ্‌লে, তোমার কথাতেই হাঁপ ঝরে পড়ল।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণীষাকে ডাক্‌লে, মণি!

কি?

আমার ইচ্ছে করচে তোমার মুখখানার সঙ্গে চাঁদের উপমা করি। আকাশের চাঁদটা মনে হচ্চে তোমার

মুখ আর নীল আকাশটা হচ্চে আমার বিরহাতুর বুক !

মণীষা হটাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি-ভরা চাউনি নিয়ে বল্লে, কলম আন্‌বো, কাগজ ? এত কবিতা রাখ্‌বে কোথায়, লিখে ফেল, বেশী দামে দীর্ঘশ্বাসীদের দলে কাট্‌তে পারে।

না, তুমি নিতান্তই অকবি।

কিন্তু একটু কবি, এত বড় কবিবরের—, কি বল্‌ব গো ?

রাজা হেসে উঠে মণীষার হাতটা পেতে তার ওপরে দুটো ঘুসি মেরে কানে কানে বল্লে, প্রেয়সী।

বাধা দিয়ে মণীষা বল্‌লে, না না, প্রেয়সী কথাটা কি রকম ঠেকে, তার চাইতে প্রিয়া, কি বল ? কিন্তু আমি তোমার প্রথমা ত' ?

মোটেই নয়, বলে রাজা হাসলে। মণীষাও যে হাসলে না তা নয়, তবে সেই হাসির অন্তরালে একটু সন্দেহও জেগে উঠ্‌ল। মণীষা রাজাকে বিশ্বাস করে। সে ভাবে যদি কোনদিন রাজাকে নিয়ে সত্যিই ডোব্‌বার পথে অগ্রসর হয় তাহলে তাকে বিয়ে কর্‌বে, বিয়ে কর্‌তে ত' তাদের আট্‌কাবেনা। কিন্তু যখন ঠাট্টাচ্ছলেও

রাজা এই কথাটা বল্‌লে, তার ক্ষণিকের জন্যে সন্দেহ হল হয়ত রাজার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ তার দেহ। বল্লে, চল, অনেক রাত হয়ে গেল যে!

রাজা হেসে বল্লে, এখানে তোমাতে আমাতে সমস্ত রাত থাকলেই বা ক্ষতিটা কী?

বাড়ীতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান।

দু' হাত দিয়ে পূর্ণচন্দ্র দিলেও ক্ষতি নেই যদি তোমার সঙ্গে কাটান যায়।

আমার সঙ্গকে তুমি অত মধুর বলে মনে কর কেন? আমি কিন্তু তোমার সঙ্গ অত মধুর মনে করি না।

মুখটা গম্ভীর করে রাজা বল্লে, তার কারণ তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমাকে জোর করে আমার দিকে ধরে রাখা অবশ্য অন্যায় হয়েচে।

স্বরটা যথাসম্ভব করুণ করে রাজা এই কথাগুলো মণীষাকে বলে তাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। আড়চোখে একবার তাকে দেখে নিলে, দেখ্‌লে কথাটা একটু কাজ করেচে।

নয়

সেই সময়টা চারিধারে ভয়ানক বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল।

নির্ম্মলদের বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতায়। যদিও এ পল্লীতে বসন্তের প্রকোপ খুব ছিল না, তবুও একদিন জ্বর নিয়ে নির্ম্মল বাড়ী ফিরল, কোমরে পিঠে অসহ্য বেদনা। বেশীদিন দেরী হল না, গায়ে বসন্ত দেখা দিলে। বীরেশের মাথা থেকে সমস্ত আইডিয়া ঝর ঝর করে মাটীতে পড়ে গেল, সেগুলো তুলে নেবার সময় পর্য্যন্ত পেলে না, বোনকে নিয়ে চলে গেল দেশে। রেখা কিছু বল্লে না। যখন ভয়ানক বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ল, তখন একদিন রেখা সলিলকে খবর দিলে, সে নিজে একা আর পারে না। সলিল এসে রেখাকে দূরে সরিয়ে রেখে দিলে, বল্লে, তোমার দাদার ভার আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। রেখা মৃদু হেসে বল্লে, তা' না হলে এত চাকর-বাকর লোকজন থাকৃতে তোমা-কেই এ কাজের উপযুক্ত বলে মনে হল কেন!

সলিল বল্লে, যাকে ভালবাসা যায় তাকে বোধ হয়

সব কাজেরই উপযুক্ত বলে মনে হয়, আসলে হয়ত' সে কিছুই না।

সলিল প্রাণ দিয়ে নির্ম্মলের সেবা করতে লাগল। যতদিন না নির্ম্মল সেরে ওঠে ততদিন সলিল রেখাদের বাড়ীতে থাকতে লাগল।

কিছুকাল পরে নির্ম্মল সেরে উঠলে সলিল রেখাকে বল্লে, আজকে আমি যাব।

রেখা হাঁ না কিছুই বল্লে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রেখা নীরবতা ভেঙে বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় এটা দাদা মোটেই পছন্দ করেন না, এ বোধ হয় তুমিও বুঝতে পেরেচ?

সে আমি বহুদিন জেনেচি।

কিন্তু যাবার আগে আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও।

কী!

দাদার অমতে তোমার সঙ্গে মেলবার মত শক্তি আমার নেই। এই দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবে!

সলিল হেসে ফেললে, বল্লে, তুমি ত' জান, ক্ষমা

করবার মত মনের উদারতা আমার নেই। ক্ষমা আমি কাউকে করি না।

রেখাও হেসে উত্তর দিলে। বল্লে, উঃ, তুমি কী ছেলে গো, কবে সেই শোন নদীর ধারে তোমাকে অনুদার বলেছিলুম সে কথাটা আজও মনে করে রেখেচ!

নির্ম্মলের ঘরে এসে সলিল বল্লে, আজকে আমি যাচ্চি, নির্ম্মল-দা।

আচ্ছা এসো। বলে নির্ম্মল পাশ ফিরে শুলে।

ফিরে এসে সলিল দেখলে রেখা ঘরে নেই। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রেখা এল, তার মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন দেখে বিস্ময় অনুভব করলে। রেখার চোখ লাল হয়ে উঠেচে। সে সলিলের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে-থেকে হটাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। অতীব বিস্ময়ান্বিত হয়ে সলিল রেখার মাথাটায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, তুমি কাঁদচো কেন, রেখা?

রেখা নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পরে উঠে চোখ মুছে বল্লে, আমার একটা কথা রাখবে? রাখ্‌বে ঠিক, বল। বলে অপূর্ব্ব অনুপম ভঙ্গীতে এমন ভাবে সলিলের দিকে দুটো ম্লান করুণ চোখ রেখে বল্লে যে সলিল 'না' বল্‌তে পারলে না।

বল্লে, রাখবো, কী বল ?

তুমি বিয়ে করে ফেল। আমাদের যখন এ মিলন হবেই না, তখন তোমাকে আমি বৃথা আশা দিয়ে কী করব ? তুমি শুধু শুধু কষ্ট করে কী করবে ! তুমি বিয়ে করে সুখী হয়ো।

কিন্তু তোমাকে আমি না পাওয়ার দুঃখটা ভুলব কী দিয়ে ?

মেয়েদের পরিচয় তোমার সম্পূর্ণ জানা নেই বলে তুমি ও কথা বলচ। তোমার স্ত্রী তার স্নেহের স্পর্শ দিয়ে তোমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুছে, ফেলে দেবে। আমাকে ভালবেসেছিলে অথচ আমাকে পেলে না, একথা যখন সে জানবে, সে করুণায় ভিজে গিয়ে ভালবাসার আবরণে তোমাকে ঢেকে রাখবে, এ কথাটা আমার অবিশ্বাস করো না।

সলিল চমকে উঠল। রেখার স্থানে আর একজনকে ভাবতে তার এতটুকু ইচ্ছে করে না, রেখা যে তার কাছে একটা আদর্শের মত, পূজারীর কাছে দেবতা যেমন।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সলিল বল্লে, আচ্ছা, তাই হবে।

কিছুক্ষণ আবার কাট্‌ল। সলিল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, কিন্তু তোমার কাছে যা চেয়েছিলুম তা কি দেবে?

ভেতর থেকে ফটোটা নিয়ে এসে সলিলের কাছে ছুম্‌ করে ফেলে দিয়ে বল্লে, এই নাও, আর তুমি এসো না, কে বল্লে আমি তোমাকে ভালবাসি, একথা একেবারে মিথ্যে।

বলে রেখা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হায়রে, রেখা বুঝলে না যে, যে কথাটা সে এত জোর গলায় মিথ্যা বলে প্রমাণ করে গেল সেইটেই হল সবচেয়ে সত্য বলে প্রমাণিত।

দশ

রাজা হাতে একটা মোড়ক নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে মণীষার ঘরে ঢুক্‌ল। মণীষা তখন সবেমাত্র প্রসাধন করে শেষবার মুখে একটু পাউডার মাখ্‌ছিল। পেছন থেকে পা টিপে-টিপে রাজা মণীষার বগলের ভেতর দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে তাকে চেপে ধরে বল্লে, তুমি কী সুন্দর! ইচ্ছে করচে তোমাকে আমার এই বুকের ওপরে যুগযুগান্তর ধরে রাখি।

মণীষা হাত দুটো ছাড়িয়ে ঘুরে রাজার মুখোমুখি হয়ে বল্লে, তুমি এসে বসেচ, আজ আর তা'হলে আমার যাওয়া হবে না, বেশ বুঝতে পারচি!

রাজা মণীষাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে বেঁধে তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়ে বল্লে, আজ আর কোথায় তুমি যাবে, আজকে তোমার অভিসার আমার বুকে। এই বুকে তোমার শয্যা পেতে রেখেচি।

ছাড়, কে এসে পড়বে এখুনি।

এলোই বা, ক্ষতি কি! আমরা ত' আর কিছু মন্দ কাজ করচি না।

মণীষা জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, অনূঢ়া যুবতী মেয়ের ঘরে ঢুকে তাকে আলিঙ্গন করাটা যদি দোষনীয় না হয়, তবে জগতে মন্দ কাজটা কী, শুনি?

জগতে ভালমন্দ বলে কোনও জিনিষ নেই, মণি। ভালমন্দ বিচার করবার মাপকাঠি আজও বেরোয় নি। জগতের যতগুলো সমস্যা আছে তার মধ্যে এ সমস্যাটা খুব ছোট নয়। অতএব ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজে যাকে সুখ বলে মনে করা যায় তাই করা ভাল নয় কি?

বাঃ, তোমার নিজের জীবনের অনুযায়ী বেশ যুক্তি করে রেখে দিয়েচ। জীবনে এমনি মজা, মানুষ যা' করে, তার সপক্ষে একটা যুক্তি ঠিক করে রেখে দেবেই, সে তার কাজকে ভাল বলে প্রমাণ করবেই, যতই-কেন সে মন্দ হোক্ না কেন!

রাজা একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, বেশ, আমি যাচ্চি। বলে মোড়কটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। বাস্তবিকই চলে যায় দেখে মণীষা তার পথ আট্‌কে বল্লে, মশাইয়ের কি মাথায় রাগ উঠে গেল নাকি? না গো না, তুমি যত ইচ্ছে আমার ঘরে এসো, একটুও তা' মন্দ নয়।

রাজা হেসে বল্লে, আবার ঠাট্টা! মোড়োকটা খুলে একটা ছোরা বার করে বল্লে, এইটে আজ তোমায় উপহার দিতে এসেচি মণি। তুমি নাও। বলে তার হাতে দিতে যাচ্ছিল। মণীষা হাতে করে না নিয়ে রাজার অতি •সন্নিকটে এসে বল্লে, এইত' এসেচি, ওটা হাতে না দিয়ে বুকে বসিয়ে দাও।

মণীষা বুকটা একটু উন্নত করে দিলে, রাজা ছোরাটা মোড়কের ভেতরে রেখে সেই বুক নিজের বুকে বেঁধে বল্লে, এ বুকে ফুলের আঘাতই সয় না, ছোরার আঘাত সইবে কেমন করে; মণি!

এগুলো কি মন্দ কাজ নয়? বলে মণীষা হাস্‌লে! রাজা তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে, আচ্ছা যাচ্চি। একটু-খানি এগিয়ে বল্লে, না যাব না। তোমার আর কি, আমি চলে গেলে নীচের চায়ের আসরের বন্ধুগুলো বাঁচে। এবং তাদের মধ্যে প্রথম ভাগ্যবান্ পুরুষটী যে কে, সে আমি জানি।

বাস্তবিকই মেজদা'র আর একটী বন্ধু এবং তাদের পাড়ারই ছেলে বিজয়ের সঙ্গে মণীষা মাঝে মাঝে বেশ ঠাট্টা তামাসা করত'। অনেক সময় রাজা বিজয়ের নাম উল্লেখ করে মণীষাকে ক্ষেপিয়েছে।

আজকে যে রাজা তারই কথা বল্‌চে একথা জানতে পেরে মণীষা বলে উঠ্‌ল, কে, বিজয়-দা? বাবা, তুমি কী লোক? আমাকে তুমি কী ভাব বলত?

রাতে যারা দেহের বেসাতি করে তাদের দলভুক্ত না হলেও তাদেরই কাছাকাছি যাও, কেন না মনের নেয়া-দেয়া অনেকদিনই অনেক জায়গায় হয়ে গেছে।

কী রকম!

কী রকম আর। কোনদিন শ্রাবণের সজল সন্ধ্যায় বাতায়নে বসে পাশের বাড়ীর বি, এ, পড়ুয়া ছেলেটীকে বুকের ভেতরে টেনে নিতে ইচ্ছে করে নি কি?

মণীষা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে বল্লে, দেখ, তুমি আমার বিশেষ কেউ নয়. মাত্র ভাইয়ের বন্ধু। কিন্তু তোমাকে আমি বা দাদা বা মা যা প্রশ্রয় দিয়েছেন তা' তোমার ধারণায়ও আস্‌বে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন অধিকারে আমাকে আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে অপমান করচ? যে অধিকার তোমার ছিল, তা তুমি ভেঙে দিচ্চ, যাও, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ভালবাসার অভিনয় করো না।

রাজা কিন্তু দম্‌ল না। এমন উচ্চ হাস্য করে উঠ্‌ল যে মুহূর্ত্তের জন্যে মণীষা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বল্লে, মণি, তুমি যে সামান্য একটা ঠাট্টায় এতখানি রেগে যাবে, এ আমি ধারণা করতে পারি নি। আমি কিন্তু ঘণ্টায় পনের বার করে প্রেমে পড়ি, পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত যতরকমের জাতির মেয়ে আছে, আমি সকলকেই মাঝে মাঝে ভালবেসে ফেলি। আমাকে যদি কেউ এ নিয়ে ঠাট্টা করে আমি রাগি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণীষা বল্লে, হ্যাঁ, সব জিনিষ নিয়ে ঠাট্টা চলে, কিন্তু মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে ঠাট্টা করা কোন শিক্ষিত ভদ্র যুবকের উচিত নয়, এ ত' করে অসভ্য পাড়াগেঁয়ে বর্ব্বর জানোয়াররা।

রাজা কিছু বল্লে না। ভাবলে, তুমি সত্যি করবে সবই, বল্লেই তোমার সতীত্বে আঘাত করা হল। এত বড় দাম যদি সতীত্বের ওপরেই দাও, তাহলে আমার সঙ্গেই বা এত অবাধে মেশো কী বলে? মনে মনে সে একটু হাস্‌লে। মুখে কিন্তু বেশ গম্ভীর হয়ে বল্লে, আচ্ছা, আমায় ক্ষমা কর, আমি ভুল করেচি। বলে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল

তারপরে কিছুদিন রাজা আর আসে নি। মেজ-দা ডাকতে পাঠিয়েছিল, বলে পাঠিয়েছে তার অসুখ। মণীষার দু'একদিন মনটা একটু কেমন কেমন করতে লাগল, কিন্তু দু'দিনই মাত্র, তার বেশী নয়।

এপার

বেনারস থেকে ফিরে এসে বিজয় একদিন মণীষা-দের বাড়ীতে দুপুর বেলায় হাঁক ডাক সুরু করে দিলে। সে দিনটা ছিল রবিবার। মেজ-দা'র বাড়ী থাক্‌বারই কথা, কিন্তু সেদিন একটা বিয়ের তারিখ পড়াতে সে শনিবার দিনই কল্‌কাতা থেকে রওনা হয়ে কোথায় কোন পল্লীগ্রামে বন্ধুর বিয়েতে যোগদান করতে গেছে। মণীষা নীচের বৈঠকখানাতেই পড়্‌ছিল, তার পরীক্ষা আসন্ন। দরজা খুলে দিয়ে মণীষা উচ্চ কোলাহলে বলে উঠল, কি বিজয়-দা, পথ ভুলে?

না মণি, সেই যে বেনারসে গিয়েছিলুম, আজকে সকালে ত' পৌঁছেচি, কিন্তু এসেই তোমাদের বাড়ী এসেচি, এত টান কিন্তু খুব কম লোকেরই হয়, আর যাই বল? ঘুমে চোখ ঢুলে আস্‌চে, রাত্রে ট্রেনে একটুও ঘুম হয় নি।

একটু মৃদু হেসে মণীষা বল্লে, বেশ ত', এখানে ঘুমোও না।

কোন ঘরে, বলে বিজয় একটু হাস্‌লে।

কেন, আমার ঘরে। বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে মণীষা উত্তর দিলে।

বিজয় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, অবশ্য তুমি যদি সে ঘরে থাক তবেই শুতে রাজি আছি, নতুবা নয়!

মণীষা বিজয়ের হাতটা নিয়ে নেড়ে দিয়ে বল্লে, যাও, বাজে কথা ছেড়ে দাও। বেনারস থেকে যা আন্‌তে বলেছিলুম এনেচ, না অন্য কোন মেয়েকে দিয়ে এলে?

না, অন্য মেয়ে আর কোথায় পাব?

কেন, বন্ধুর বোন, বোনের বন্ধু, কাজিন্, ট্রেনে আলাপী, মেয়ের আবার অভাব? মেজ-দা'ই তোমার একা বন্ধু নয়, আরও ত' তোমার কত বন্ধু আছে, তাদের কি একটাও বোন-টোন্ নেই?

বিজয় হেসে ফেল্লে। মণীষার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বল্লে, এই মাথাটার ভেতরে আরও কত দুষ্টুমি ভরা আছে! ছেড়ে দিয়ে বল্লে, যাক্, তোমার মেজ-দা কোথায়?

দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে মণীষা বল্লে, যার খবর নিতে এসেছিলে, তার ত' খবর পেয়েচ, আবার মেজ-দা'র খবর কেন?

বিজয় হেসে পকেট থেকে একটা জিনিষ বার করে মণীষার হাতে দিয়ে, যাই পালাই, চোর ধরা পড়লেই অস্থির, বলে বেরিয়ে গেল।

বার

সলিলের মন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। এত বড় ভুল সে জীবনে কখনো করেনি। এ ভুল শোধরাবেই বা কী করে! সে সাধারণতই অন্যের চেয়ে একটু বিবেচক। প্রত্যেক বিষয়েই সে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে তবে কাজে হাত দেয়, কিন্তু এবারে সে এমন ভুল করলে কেন! সে কেন রেখাকে তার ভালবাসা জানিয়েছিল ; না জানালেই ত' ভাল হত। যখন রেখার সঙ্গে তার পরিচয় হল তখন সে রেখাকে দেখে প্রথমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এ খুব সত্য কথা! এবং সে জন্যে সে কী করবে প্রথমে ঠিক করতে পারে নি। কিন্তু যখন এই মোহভাব কেটে গিয়ে রেখার প্রতি তার এক নিবিড় ভালবাসা মনের কোণে কোণে জমা হয়ে উঠে সমস্ত মনটা অধিকার করে বস্‌ল, তখন সে ভয় পেয়ে উঠ্‌ল। অনেক ছেলে ভয় পায় না, কিন্তু সলিল পেলে। সলিল বুঝলে মনকে বিশ্বাস করা যায় না। কখন হয়ত কোনদিন সে রেখাকে তার এ ভাল-বাসা জানিয়ে বস্‌বে, সব সময় নিজেকে পাহারা দিয়ে

বেড়ান সম্ভব নাও হতে পারে। এই ভয়ে সে একদিন অকস্মাৎ একটা ঝড়ো হাওয়ার মতই শোন নদীর বালুরাশি পেছনে ফেলে এল।

কিন্তু মনের ভাব অনেক সময় চেপে রাখা শক্ত; শুধু শক্ত নয়, বোধ হয় অসম্ভব। তাই রেখা সলিলকে চিন্‌তে পারলে। কলকাতায় ফিরে এসেও সলিল চেয়েছিল যাতে রেখা তার মনো ভাব এতটুকুও না বুঝতে পারে! কিন্তু এখানেও তার দুর্ব্বলতা বহুদিন প্রকাশ পেয়েছে। রেখাদের বাড়ীতে যদি না আস্‌ত, তাহলে হয়ত' রেখা ধীরে ধীরে সলিলকে ভুলে যেতে পারত। কিন্তু তখন সলিল নির্ম্মলের অতি নিকটতম বন্ধু। সলিল একদিন না এলেই পরের দিন নির্ম্মল সলিলকে ডেকে পাঠাত। অতএব সলিলকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, সে ত' চেষ্টা করেছিল নিজের মনোভাব গোপন করতে, পারে নি বলেই কি তাকে সমস্ত দোষ মাথায় পেতে নিতে হবে! হাঁ সলিল, হবে। তোমার মত যুক্তি দিয়ে একজন হত্যাকারীও বল্‌তে পারে, আমি যে চেষ্টা করেছিলুম খুন না করতে, কিন্তু আমার মন আমার ইচ্ছাশক্তির ওপরে জয়ী হয়ে খুনী হতে বাধ্য হল। এরকম যুক্তি খাটে না।

কিন্তু রেখাকে ভালবেসে এবং তা' জানিয়ে সলিল দোষ করেছে কতখানি! রেখাকে খুন করেছে, রেখার জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে, যে রেখা এক দিন উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে কোনও অতি গুণবান ও অর্থবান তরুণ যুবকের সঙ্গে মিলিত হতে পারত, সেই রেখা এখন একজন অর্থহীন, সাধারণ শিক্ষিত যুবককে পাবার জন্যে চিন্তাক্লিষ্ট! বিয়েটা যদি ব্যক্তিগত জিনিষ হত, তাহলে সলিলকে এই সমস্যায় পড়তে হত না, কিন্তু এটা যে হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক অনুষ্ঠান। অতএব বিয়ের ব্যাপারে মেয়েছেলের হাত বিশেষ নেই, আছে সমাজের হাত যতখানি। অতএব যখনই কেউ ভালবেসে বিয়ে করতে চায়, তখনই সমাজ তার শাসনদণ্ড নিয়ে এ ভালবাসার প্রতিবাদ করে, বিশেষ করে সে ভালবাসা যদি সমানে সমানে না হয়! সলিল যদি রেখার মতই ঐশ্বর্য্যশালী হত, তা হলে এ মিলন খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত না, আর সলিলের মনে আজ যে সমস্যা উঠেছে সে সমস্যা এমনভাবে তার চোখে ধরাও পড়ত না। কিন্তু সে যে গরীব, অতি গরীব! আজ যদি নির্ম্মল বলে, রেখার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে কোনও আপত্তি নেই! কিন্তু

রেখাকে রাখ্‌তে পারবে ত’? তখন সলিল কী উত্তর দেবে! নির্ম্মল কি ভাব্‌বে না, একটা কর্ম্মহীন যুবকের স্পর্দ্ধার কথা! সে কি হাস্‌বে না, ভাব্‌বে না কি যে আগে টাকা রোজগার করতে শেখ, তারপরে আমার ভগ্নীর প্রতি ভালবাসা জানিও।

সলিল চিন্তায় বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। তার মন মুশ্‌ড়ে ভেঙে পড়ে-পড়ে। মনে মনে ভাবলে, যদি নির্ম্মল তাকে না কিছু বলে তাহ’লেও তার মুক্তি নেই। ভাল সে বেসেছেই রেখাকে এবং তা প্রাণে মনে। ভালবাসাটা ত’ সাধারণ জগতের জিনিষ নয়, এটা অতীন্দ্রিয়! সত্যকারের ভালবাসার কাছে অর্থ, রূপ, গুণ, এই সমস্ত জাগতিক জিনিষের প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। অতএব সে রেখাকে ভাল-বেসে এতটুকু খারাপ কাজ করেনি, সে ভুল করেছে সেই ভালবাসা জানিয়ে। কেন সে ভালবাসা জানাতে গেল। যদি সে না জানাত, তাহলে আর যাই হোক রেখা তাকে ভালবাস্‌লেও নিশ্চয়ই অন্যস্থানে বিয়ে করে সুখী হতে পারত! আজ হয়ত’ রেখা বল্‌বে, আমি তোমাকেই শুধু চাই, আমি আর কিছু চাই না। কিন্তু তাই বা সে কী করে পারবে! যে রেখার একটা

কথায় দশটা চাকর ওঠে বসে, যে রেখা জীবনে এতটুকু অভাবের রক্ত-শোষণ-কারী তীব্র উৎপীড়ন সহ্য করেনি, যার এমন কি অভাবের জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নেই, সেই সোণার প্রতিমা রেখাকে সে কী বলে কালো কুৎসিত দারিদ্র্যের ভেতরে টেনে আন্‌বে। কী ভুল, কী ভুল !

সলিল রেখার ফটোটা তার কোনও চিত্রকর বন্ধুকে দিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা অয়েল পেন্টিং করিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। হটাৎ সেই ফটোটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার যেন মনে হল, রেখা তাকে যেন তার এই ভালবাসার জন্যে অভিশাপ দিচ্ছে। যেন রেখার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর ! প্রতিমা যেন কালো হয়ে উঠেছে ! সলিল অজ্ঞাতসারে বলে উঠ্‌ল, রেখা, রেখা, আমার এই ভুলের জন্যে আমাকে ক্ষমা করো। আমিত' মানুষ, আমি অজ্ঞাতে ভুল করেচি মাত্র, কিন্তু জেনে শুনে অপরাধ করি নি। তোমাকে ভুল করে ভালবাসার জন্যে ক্ষমা করো, আমি এবার থেকে চেষ্টা করবো তোমার কাছ থেকে দূরে থাকৃতে, তোমাকে আমার ভালবাসাটা মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে !

সলিল জীবনের কাজ ঠিক করে নিলে। তার সুমুখে আছে কেবল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ কর্ম্ম প্রয়াস। এ ছাড়া তার জীবনে কিছু নেই, দিনরাত কেবল কাজ আর কাজ, কিম্বা কাজের প্রচেষ্টা! এ জীবনে তার পরিচিতা নারী রেখা বলে কেউ ছিল, বা আবার তার জীবনে রেখা আস্‌বে, এ কথা সে একেবারে ভুলে যাবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। রেখা তার জীবনে ছিলও না, কোনদিন সে তার জীবনে আস্‌বেও না। যদি কোনদিন ঘটনার সম্মেলনে তার সঙ্গে রেখার দেখা হয়, সে উদাসীন থাক্‌বে, বেশী আগ্রহও দেখাবে না আবার খুব বেশী অগ্রাহ্যও করবে না। চিন্তার স্রোত যখন এইরকম করে বয়ে চলেছে এমন সময় রেখার চাকর এসে খবর দিলে তাকে একবার রেখাদের বাড়ী যেতে হবে।

আজ বহুদিন হল এই সমস্ত চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়ায় এবং এই সমস্যার মাঝখানে তার কী করা কর্ত্তব্য এই প্রশ্ন মনে উদিত হওয়ায় সলিল রেখাদের বাড়ী যেতে পারে নি। যখনই মনে হয়েছে যাবার জন্যে, তখনই তার বিবেক তাকে ধমক দিয়ে উঠেছে।

বাস্তবিকই সে যেন চঞ্চল না হয়ে ওঠে, সে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেই রেখাও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে, ফলে রেখার সঙ্গে নির্ম্মলের মনোমালিন্য হবে। কিন্তু আজ যখন রেখা সলিলকে ডেকে পাঠালে, তখন সে ডাক্‌-কে অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি দুর্ব্বল সলিলের ছিল না। দেবতার ডাক শুনে ভক্ত যেমন পাগল হয়ে ছোটে ঠিক তেমনি ধারা অবস্থায় সলিল রেখার কাছে এসে দাঁড়াল!

রেখার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সলিল মুহূর্ত্তের জন্যে মূঢ় হয়ে রইল। রেখার চোখে আজ এ কী দৃপ্ত উজ্জ্বলতা, মুখে আজ এ কী অপরূপ শ্রী! মাথার ঘোমটা খুলে ঘাড়ের ওপরে পড়েছে, চুলের একভাগ বুকের ওপরে লতিয়ে রয়েছে। যে রেখাকে সে সাধারণত জানে, সে রেখা যেন এ নয়, সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভেতর থেকে আজ যেন চিন্ময়ীর আবির্ভাব হয়েছে! রেখাকে ত' আজ সলিলের প্রেয়সী বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না, আজ মনে হচ্ছে রেখা দেবীর রূপ নিয়ে তার জীবনের কুৎসিত কালিমারাশি ভস্মস্মাৎ করে দিয়ে গেল! রেখার এই রূপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকৃতে থাকৃতে সলিলের মনে হল সে যেন

দেবলোকের মানুষ হয়ে গেছে, জগতের সমস্ত নীচতা, দৈন্যতা থেকে সে আজ মুক্ত!

হটাৎ তার চমক ভেঙে গেল। রেখা প্রশ্ন করলে, অতি গম্ভীর আদেশপূর্ণ কণ্ঠে সিংহীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে, তুমি দিন দিন এরকম হয়ে যাচ্চ কেন? আগেত' প্রায়ই আস্‌তে, আজকাল তুমি আস না কেন?

প্রশ্নটী এমনভাবে করলে যেন মনে হল, সলিল কোনও গুরুতর দোষ করেছে আর তারই জবাবদিহি করতে হচ্ছে বিচারকের কাছে। কিন্তু অন্য ভাবধারাও সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তার সঙ্গে মিশে গেল। সলিলের মনে হল রেখা যেন বল্‌চে, মাথার গুণ্ঠন খুলি' ক'ব তারে, মর্ত্তে বা ত্রিদিবে একমাত্র তুমিই আমার!

সলিল চিন্তায় ব্যস্ত থাকাতে রেখার প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হল। রেখা মাথার ওপরে ঘোমটা টেনে দিয়ে বল্লে, তুমি চুপ করে রইলে যে!

সলিল মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লে রেখার দেবীর ভাব চলে গেছে, সে হয়ে এসেছে তার প্রিয়া। ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, তোমাদের জীবনে ভালবাসাটাই সব, আমাদের জীবনে ওটা প্রায় কিছুই নয়। তাই তুমি যখন তোমাদের আদর্শের পেছনে ছুট্‌তে থাক, আমি তখন

আমাদের আদর্শকে পূজো করি! আমাদের আদর্শ নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নেওয়া এবং কর্ম্মের পেছনে নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

তারপরে একটু থেমে বল্লে, সময়েরও একান্ত অভাব, তাই আস্‌তে পারি না।

রেখা কিছু বল্লে না, চুপ করে রইল। সে ত' বড় অন্যায় করচে সলিলকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠিয়ে বিরক্ত করে! সলিলের সঙ্গে তার জীবন এক হয়ে গেছে। তার কাজের ক্ষতি করে নিজেরও সর্ব্বনাশ করচে। সলিলের যে আদর্শ, উপযুক্ত স্ত্রীর উচিত হচ্চে সেই আদর্শের দিকে স্বামীকে সহায়তা ক'রে এগিয়ে দেওয়া! ছি, ছি, কী ভুল করচে সে! সাধারণ অজ্ঞ নারীর মত সেও নিজের উপস্থিত সুখের জন্যে স্বামীর কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে আরম্ভ করচে।

তার চিন্তাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে সলিল প্রশ্ন করলে, আর আমার আসাও ত' খুব সহজ নয় এখানে। আমি এলে নির্ম্মল-দা যথেষ্ট বিরক্ত হন।

রেখা রাগ করে উঠল, বল্লে, দাদার বিরক্ত হবার কারণ কী? এ বাড়ীতে কি আমার অধিকার নেই। তুমি আস আমার কাছে; দাদার এতে

বিরক্ত হওয়া উচিত নয়

এ ভাবের কথা রেখার মুখ দিয়ে সহজে বেরোয় না। কিন্তু সলিলের অদর্শনে তার মন ভয়ানক বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তাই আজ যখন শুন্‌লে নির্ম্মলের বিরক্তির জন্যেও সলিল আস্‌তে কুণ্ঠা বোধ করে তখন সে নিজের অধিকার স্পষ্ট জানিয়ে দিলে। এ কথা খুব সত্য যে যা কিছু তাদের আছে তা' তার বাপ তাদের দুটী ভাই বোনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে যান। কিন্তু তবু ও কথা বোধ হয় রেখার মুখ দিয়ে বেরোতো না, যদি সলিলের ওপরে নির্ম্মলের বিরক্তি রেখার বুকে যথেষ্ট আঘাত না দিত।

সলিল এতদিন জান্‌ত না যে রেখারও তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার আছে। যখন রেখার মুখে এ কথা শুন্‌লে তখন তার সুমুখে আর একটা সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াল। রেখা তাহলে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী! এখন সলিল যদি রেখার সঙ্গে বেশী মেশামেশি করে বা তার জন্যে কিছু আগ্রহও দেখায় তাহলে এ কথা জান্‌তে কারুর বাকী থাক্‌বে না যে গরীব সলিল রেখার অর্থের জন্যেই রেখাকে বিয়ে করেছে! এত বড় একটা মিথ্যেকে তাকে ভোগ করতে

হবে। রেখার সঙ্গে আলাপ পরিচয় যে করে হোক, যে ভাবে হোক, তাকে তুলে দিতেই হবে।

কী ভাব্‌চ? রেখা তার কালো চোখ দুটী তুলে সলিলকে প্রশ্ন করলে।

না, কিছু না। বলে একটু চুপ করেই বল্লে, হ্যাঁ, আমি উঠ্‌চি, একটু কাজ আছে, আবার দেখা করব'খন।

বলে সলিল উঠ্‌তে যাচ্ছিল। রেখা বাধা দিয়ে বল্লে, একটু বস, একটা কথা আছে।

সলিল বসে পড়ল।

রেখা বল্লে, তুমি মাঝে মাঝে এসো লক্ষীটি!

আস্‌ব, বলে সলিল বেরিয়ে গেল।

রেখা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে, কারণ বোধ হয় সলিলের ঔদাসীন্য। কিন্তু রেখা যদি সলিলের মনোভাব এতটুকু বুঝত' তাহলে সলিলের প্রতি যেটুকু অভিমান হয়েছিল তা' হোত না।

কিছুদিন আগের একটা ঘটনা রেখার মনে পড়ল। তাদেরই বাড়ীর সুমুখ দিয়ে একদিন সলিল দু' চারটী মেয়ে নিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন চলে যাচ্ছিল।

সলিল মেয়েদের সঙ্গে সাধারণত মেশে না, তবে অনেক সময় মিশ্‌তে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই মেয়েগুলি ছিল তারই এক বন্ধুর আত্মীয়া। সেই বন্ধুটি থাকে এলাহাবাদে। পূজোর সময় এসেছিল, তাই সলিলকে ধরে নিয়ে সকলে একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

রেখা যখন তার উন্মুক্ত জানলা থেকে দেখলে সলিল তার বাড়ীর ধার দিয়ে গেল অথচ এলো না, তখন তার সামান্য একটু রাগ হল, দুঃখও যে হলো না তাও নয়। অমন মধুর জোৎস্না রাতে প্রিয়তমকে কাছে পাবার ইচ্ছে সকলেরই হয়! আর যখন দেখা যায় সেই প্রাণের প্রিয় অবহেলা করে চলে গেল তখন যা অভিমান জাগে, যে বেদনা বুকে আঘাত করে তা বুঝি বল্‌বার নয়! তাই যখন কিছুক্ষণ পরেই সলিল একা এসে রেখাদের বাড়ী ঢুকল, তখন রেখা ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করলে, মশাই চলেছিলেন কোথায়?

সলিলও হেসে উত্তর দিলে, ভক্তের যাবার জায়গা মাত্র একটী আছে। দেবতা দর্শনে চলেছিলুম। কিন্তু দেবতা বড় বিমুখ!

রেখা বুঝলে সলিল তার কথাই বল্‌ছে।

মুখটা সামান্ত একটু গম্ভীর করে বেখা বল্লে, কিন্তু ভক্তের ভক্তির জোরও কম নয়, তাকে বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাতে হয়! ভক্তকে পাবার জন্তে দেবতাই চঞ্চল! কিন্তু এমনি হয়েচে যে যুগের ধারায় সব গোলমাল হয়ে গেছে, দেবতাই আজকাল ভক্তের পায় অঞ্জলী ঢালে। কিন্তু ভক্তরা এমনি পাষাণ যে অনেক জোড়া হাত অঞ্জলি না দিলে তাঁদের মনে আনন্দ হয় না।

বলে হাস্তে হাস্তে সলিলকে প্রণাম করলে।

একটু দূরে সরে গিয়ে সলিল বল্লে, আবে কর কি, কর কি!

প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে রেখা চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ ভরিয়ে বল্লে, বাঃ, আমার বিজয়া দশমীর প্রণাম বাকী রয়েচে যে!

প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে পর সলিল পূর্ব্বের কথার রেশ টেনে একটু ম্লান হেসে বল্লে, কিন্তু রেখা, আমার ত' অনেক দেবতা থাকতে পারে না, আমি যে একেশ্বরবাদী! কোন কালে শুনেচ যে যারা এক ভগবানকে বিশ্বাস করে তারা সহজে কখনো বহু দেবতার উপাসক হয়?

রেখার মনে যে সামান্য একটু সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে তা সলিল বুঝেই ঐ কথাগুলো বল্লে।

সলিলের কথায় রেখার চমক ভাঙ্‌ল। বাস্তবিকই সে করেছে কী! যে কী না সমস্ত সন্দেহের ওপরে তাকে সন্দেহ করে সে নিজেকে কত ছোট করেই না ফেলেছে।

তের

মাস ছয় পরে একদিন সলিল রেখাদের বাড়ীতে এসে হাজির হল। এই মাস ছয়ে জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে যায় কিন্তু সলিল বা রেখার উভয়েরই জীবনে নূতন কোনো ঘটনা ঘটেনি। কেবল নির্ম্মল রেখাকে বিয়ে করবার জন্যে বারবার অনুরোধ করেছে।

সলিল এসে শুনলে, নির্ম্মল বাড়ী নেই। কী করবে ভাবচে, এমন সময় রেখা এসে বল্লে, তুমি এখানে যাতায়াত কর, তাতে আমার আপত্তি নেই বা কারুর থাকেও না, কিন্তু দাদার অনুপস্থিতিতে তোমার না আসাই ভাল। আর আমার জন্যেও ত' আস্‌তে, আমিও চলে যাচ্চি।

রেখা ভেবেছিল সলিলের জানতে ইচ্ছে হবে সে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু সলিল কিছু না বলে বল্লে; বেশ, আমি আর নাইবা এলুম। বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল

রেখার চোখ ফেটে জল পড়তে চাইছিল, প্রাণ-পণে তা' দমন করে বল্লে, শোন, আমার বিয়ে হয়ে

যাচ্চে যে। দাদা আজ আমার বর দেখতে গেছে। বলে রেখা হাসলে কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে অশ্রুর ঢেউ ফেনিয়ে উঠ্‌ছিল।

সলিল খুব আগ্রহও দেখালে না, খুব উদাসীনও রইল না। হেসে বল্লে, তাহলে আমাদের একটা নেমন্তন্ন আস্‌চে দেখ্‌চি!

ঠিক এমন সময় নির্ম্মল এসে উপস্থিত হল। নির্ম্মলের আগমনে উভয়েই চমকে উঠ্‌ল। অপরাধী তারা না হতে পারে কিন্তু সমাজ যেটাকে অপরাধ বলে মনে করে সেই অপরাধে ধরা পড়লে মন সামান্য একটু ভীত হবেই। নির্ম্মল এদের চমকিত ভাব লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ সলিলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পরে গলার স্বর উচ্চ করে বল্লে, তুমি আমার অনুপস্থিতিতে এখানে আস কী জন্যে? আমি থাক্‌লে বুঝি আমার বোনের সর্ব্বনাশ করবার সুবিধে হয় না। দূর হও, আর এ বাড়ীতে ঢুকো না বল্‌চি।

নির্ম্মল শিক্ষিত। তার এইরকম কথাবার্ত্তা সলিলকে মুহূর্ত্তের জন্যে বিস্ময়ে বিহ্বল করে দিলে। সে কোনও কথা বল্‌তে পারলে না, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

সলিল যখন চলে গেল, নির্ম্মল পেছন ফিরে দেখলে রেখাও কখন চলে গেছে।

রেখা ঘরে শুয়ে পড়েছিল, সলিলের অপমান তার বুকেও যে কতখানি লাগছিল তা বোধ করি অন্তর্য্যামি ছাড়া আর কারুর বোঝবার শক্তি ছিল না। নির্ম্মল ঘরে ঢুকতেই রেখা চোখ মুছে এসে বল্লে, কে, দাদা?

হ্যাঁরে, তুই যে শুয়েছিলি, অসুখ বিসুখ করেনি ত'?

না, এমনি শুয়ে পড়েছিলুম।

হ্যাঁ ছাখ, রাস্কেলটাকে আজ দূর করে দিয়ে এসেচি।

নির্ম্মল ভাব্‌লে, রেখা নিশ্চয়ই এতে আনন্দ অনুভব করবে। কিন্তু যদি সে একবার রেখার বুকের ভাষা জান্‌তে পারত তাহলে বুঝত কি নিদারুণ ব্যথা রেখার সমস্ত বুকটা জুড়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। কিন্তু নির্ম্মলের অত বোঝবার শক্তি ছিল না, তাই ভগ্নীকে আনন্দের সংবাদের বদলে বুকে আর একটা শেল দিয়ে চলে গেল। রেখার বড় ইচ্ছে করতে লাগল, একবার সলিলের কাছে গিয়ে বলে, ওগো আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার,

একান্তই তোমার। তুমি ছাড়া' আমি কারু কাছে যাব না গো, যদি যাই তাহলে বুঝব আমি কুলটা হয়ে গেছি। কেন সে আজ সলিলকে এত ব্যথা দিতে গেল! তার বিয়ের কথা তাকে ত' না বল্লেই হত। যদি সে অপমানিত না হত, তাহলে সলিল তার বিয়ের কথাটা নিশ্চয়ই ঠাট্টাচ্ছলে নিত, কিন্তু এখন যে সব বদ্‌লে গেল! দাদা যে অপমান করলেন, এই অপমান করবার ভেতরে তারও যে হাত ছিল না তা' কি সে বিশ্বাস করবে! হয়ত' ভাববে, আসন্ন বিয়ের আনন্দে রেখা এত আত্মহারা যে, সে যে-কোরে হোক তাকে বিদেয় করতে চায়। কিন্তু কী করে সে বোঝাবে যে তার এতে এতটুকুও হাত ছিল না, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!

চোদ্দ

মেসে ফিরে এসে সলিল কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে যখন উঠ্‌ল তখন তার চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। অপমানিত ও আহত সলিল সমস্ত বেদনা বুকের ভেতরে জমা করে নিয়ে ফিরে এলো বটে, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই বেদনার ছাপ সুপষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। কেন জানি না, তার চোখের কোণে জল এল। মুছলে না, সেই জল পড়ল বিছানায়। মনে হল এই অপমানটা ফিরিয়ে দেওয়াই ত' পুরুষের কাজ! কিন্তু কেন, থাক্ না। একদিন এই অন্যায়ের প্রতীকার আপনা থেকেই হবে, একদিন নির্ম্মল বুঝতে পারবে সলিল তার ভগ্নীর ওপরে এতটুকু অত্যাচার করে নি, তার অভিসন্ধি এতটুকু খারাপ ছিল না। সে আবার শুয়ে পড়ল, এবং বোধ করি তার একটু তন্দ্রাও এসেছিল, এমন সময় মেজ-দা এসে সলিলকে বল্লে, চল্ চল্, তোর চাকরীর প্রায় সব বন্দোবস্তই করে এলুম। তুই একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আস্‌বি চল্।

সলিল একটা চেয়ার দেখিয়ে মেজ-দা'কে বল্লে, বোসো মেজ-দা। বলে আবার বিছানার ওপরে সটান্ শুয়ে পড়ল।

না, না, আর শুলে হবে না, এখুনি চল্, সে ভদ্রলোক হয়ত' এখুনি আবার বেরিয়ে যাবেন।

মেজ-দা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠ্ল, কিন্তু যে লোকটার জন্যে সে এত কষ্ট স্বীকার করছিল সেই লোকটা আর একবার হাই তুলে পাশ ফিরে পরিপূর্ণ ঔদাস্যে বল্লে, আমি চাকরী করব না, মেজ-দা।

সে কিরে? তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি? এই যে তুই আমাকে বলে এলি চাকরীর কথা?

তখন প্রয়োজন ছিল, আজ সে প্রায়োজন ফুরিয়েচে, আর চাকরীর কি হবে? আমার যা আছে, আর এটা সেটা করে যাহোক করে দিনগুলো কাটিয়ে দেবো।

কী ছেলেমানুষ করচিস্ বল্‌ত'? নে ওঠ্। বলে মেজ-দা প্রায় সলিলকে ঠেলে তোল্‌বার বন্দোবস্ত করলে।

বিছানার ওপরে উঠে বসে সলিল দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের

সঙ্গে বল্লে, না মেজ দা, আমি সত্যিই চাকুরী করব না। আমার কেরাণী হবার ইচ্ছে নেই।

তবে মরতে করবি কী? আজকাল এই কেরাণী-গিরিই জোটা যে কি দুর্ঘট ব্যাপার তা যদি তোর বাইরের জগতের সঙ্গে এতটুকু পরিচয় থাকে ত' বুঝতে পারবি।

জানি মেজ-দা। এই একটা চাকরীর জন্যে আকাশ পাতাল খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েচি। কত লোকের পায়ে ধরেচি, কত অবহেলা সয়েচি, কত অপমান কুড়িয়েচি। আমাকে আর চাকরী পাবার কষ্টের কথা বলো না।

বাস্তবিকই সলিলকে ও কথা বলা সাজে না! যারা খাটের ওপরে শুয়ে কাগজে পড়ে জানে যে চাকরী পাওয়া বড় দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ছে তাদের পক্ষে এ কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু যে লোকটা চাকরী লাভের জন্যে এমন পদস্থ লোক নেই যার সঙ্গে দেখা করেনি, এমনি অপমান নেই যা সয়নি তাকে এ কথা কী করে বলা যায়! কোথাও কোথাও গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভিজে দাঁড়িয়ে থেকেছে তবুও তার দিকে ফেরে নি, কিংবা বলেছে অন্য একদিন

আস্‌তে। কোথাও কোথাও আশা দিয়েছে, বহুকাল যাতায়াতের পর হয়ত' বলেছে, হবে না। এমনি কত কী!

মেজ-দা বল্লে, তাই যদি জানিস্‌, তবে কী করে তুই এ চাকরী ছেড়ে দিতে চাস?

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কোনো জিনিষেরই কোনো মূল্য থাকে না, সে ত' তুমি জান?

তখন কী এমন প্রয়োজন ছিল যে চাকরীর এত দরকার হয়ে পড়েছিল, এখনই বা কেন তা নেই?

সলিল মেজ-দার হাত ধরে বল্লে, মেজ-দা, তোমায় মিনতি করি, আর আমায় কিছু বলো না, আমি চাকরী করব না। তুমি আমার জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করেচ, তা আমার চিরকালই মনে থাক্‌বে, সে আমি কোনদিন ভুল্‌ব না।

মেজদা'র কাছে সমস্ত রহস্য ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। বুঝতে পারলে না, বাঙালীর ছেলের পক্ষে চাকরী ত্যাগ করা কী করে সম্ভব হয়! তারপর এ-কথা সে-কথা কইবার পর সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

মেজ-দা চলে গেলে পর সলিলের সমস্যা হল, বাস্তবিকই কী করবে সে! এত বড় বিশাল বিশ্ব, অথচ তার স্থান কোথায়! জগতে এত কাজ রয়েছে, কোন্ কাজের মধ্যে সে নিজেকে উৎসর্গ করবে, কোন্ কাজটা তার মনের উপযোগী হবে! অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলে সে লেখক হবে। ছেলেবেলায় তার লেখ্‌বার অভ্যাস ছিল, তার লেখা কিছু কিছু পত্রিকাতেও বেরিয়েছে। এবারে সেই লেখার চর্চ্চা করবে সে। কিন্তু লিখ্‌লেই ত' হবে না, কী লিখ্‌বে সে!

সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করা। সমস্ত জীবনটাকে নিয়ে সাহিত্যিকের কারবার। জগতের যা' কিছু ঘটনার সঙ্গে জীবনের যোগ আছে, সেই সমস্ত ঘটনাই সাহিত্যের অন্তর্গত। কিন্তু সেই সমস্ত রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে যা কিছু সুন্দর তাই নিয়ে প্রকৃত সাহিত্য গড়ে ওঠে।

এটা ঠিক, সলিলের জীবন সাধারণ জীবনের চেয়ে ঘটনাবহুল। এই সমস্ত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তার জীবনে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই সমস্ত সত্য অনেকের কাছে নূতন বলে ঠেকবে, অনেকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে! তা' দিক, তার গভীর

বিশ্বাস, সেই সত্য উপলব্ধি করলে মানুষ অনেক সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে। তাই সে নূতন ভাবধারায় সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে ফেল্‌বে, নূতন ভাবে লোককে চিন্তা করতে শেখাবে! এতদিন যে ভাবে মানুষ ভাব্‌তে শিখেছিল, তার লেখার ভেতর দিয়ে সে মানুষকে অন্য রকম ভাবে ভাব্‌তে শেখাবে। তার সাহিত্য মানুষকে সুন্দর করে গড়ে তুল্‌বে, মানুষের উন্নতির পথে যা কিছু বাধা তা' সরিয়ে দিয়ে মানুষকে আগাগোড়া একটা নূতন রূপ দেবে!

পনের

রেখা, ছি ছি, ওরকম ভাবে গোঁ ধরে বসলে চল্‌বে কেন ?

বল্‌তে বল্‌তে নির্ম্মল রেখার ঘরে ঢুকল। রেখা তখন জান্‌লার ভেতর দিয়ে কলিকাতা নগরীর জনস্রোত দেখ্‌ছিল। ফিরেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কী হয়েচে দাদা ?

তুই নাকি সরকারকে বলেচিস্‌ আমাকে বল্‌তে যে তুই কিছুতেই বিয়ে কর্‌বি না। রেখা কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

নির্ম্মল বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, মা বাপ ত' আমাদের নেই ভাই, আমাকেই সব কর্‌তে হবে। তোর যদি বিয়ে না দিই, তাহলে আমার কর্ত্তব্য করা হল না। আমাকে আর বাধা দিস্‌নে রেখা।

রেখা বল্লে, তুমিও ত' বিয়ে করনি দাদা, আমাকেই বা বিয়ের কথা বার বার বল্‌চ কেন ?

কেন যে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত নির্ম্মল অবিবাহিত রয়েছে, এই বিয়ে না করার ভেতরে কত বড় যে একটা ভগ্নী-স্নেহ লুকিয়ে ছিল তা রেখা

বুঝলেও খুব ভাল করে বুঝতে পারে নি। রেখা অনেক সময় ভাব্‌ত, দাদা বিয়ে করলে না এমনি খেয়ালে।

নির্ম্মল একটু চুপ করে থেকে বল্লে, বেশ, আমি বিয়ে কর্‌লেই তুই কর্‌বি ত' ?

রেখা এর কোনও উত্তর দিলে না। একটু থেমে বল্লে, কত মেয়েরাই ত' অবিবাহিত থাকে, আমার থাক্‌তে দোষ কী ?

দোষ আর কী, দোষ এমন কিছু নয়। রেখার মত মেয়ের অসচ্চরিত্র হবার আশঙ্কাও কম। তবে দাদার মন বুঝবে কেন ! দাদা চায় এই একটী বোনকে খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়ে সুখী করতে। দশজনে যা ভাবে সেও তাই ভাবে। তাই বল্লে, আমার কি ইচ্ছে করে না তুই বিয়ে করে সংসারী হোস্‌ ?

রেখা কণ্ঠে একটু আদেশের সুর ঢেলে দিয়ে বল্লে, দাদা, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আর বিয়ের কথা বলো না, বিয়ে কিছুতেই কর্‌তে পারবো না। আর যা বল তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমি কর্‌তে রাজী আছি, কিন্তু এ অপরাধ আমার ক্ষমা করো। বলেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লে। তার চোখের সামনে তখন ভেসে

উঠেছে বিদায় দিনের অপমান ক্লিষ্ট সলিলের সজল দুটী চোখ।

নির্ম্মল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে হয়ত' হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, তাই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ঘরে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পা দুটো টেবিলের ওপরে রেখে নির্ম্মলের আজ এই প্রথম উপলব্ধি হল, হয়ত' রেখার এই কুমারী থাকার ভেতরে একটু ভালবাসার ইতিহাস আছে। এ যদি সত্য হয়, তাহলে সেই ভালবাসার পাত্র যে সলিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। কিন্তু সলিলের সঙ্গে এতকালের পরিচয়, এর ভেতরে একটী দিনও রেখার ব্যবহারে মনে হয়নি যে রেখা সলিলকে ভালবাসে! এই চিন্তায় যখন নির্ম্মল বিভোর এমন সময় হাতে একটা চুরুট নিয়ে ঢুক্‌ল বীরেশ।

এই যে দাদা!

কে রে, বীরেশ! বোস্, বোস্।

বীরেশ চেয়ারটা খুব শব্দ করে টেনে নিয়ে বস্‌ল। যদিও বীরেশের প্রতি নির্ম্মলের অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল তার অসুখের সময় তার ব্যবহার দেখে, আজ কিন্তু সে সব কথা

কিছুই মনে হল না, ভাব্‌লে বীরেশ্বরের সঙ্গে রেখার সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌লে কিছু কাজ হতে পারে।

বীরেশ কিন্তু পুরাণো কথাটা একবার পাড়্‌লে। বল্লে, দাদা, তুমি নিশ্চয়ই ভাব্‌চ যে আমি ভয়ানক খারাপ লোক, না? কিন্তু দাদা, আত্মরক্ষা, Self Preservation-ই হচ্চে মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। এটা একটা instinct. এটা যে জন্মগত। সেইজন্যেই সে সময় তোমার অসুখ দেখেও আমায় পালাতে হয়েছিল, আর ভাব্‌লুম তোমার ত' লোকজন আছেই, আমি আবার শুধু শুধু মরি কেন? আমি স্পষ্ট তোমাকে সব বল্লুম, এতে আমাকে তুমি ভালই বল, আর খারাপই বল।

নির্ম্মলের এ কথা নিয়ে তখন মাথা ঘামাবার অবসর ছিল না। তার সমস্ত মন রেখার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। হেসে বল্লে, আচ্ছা তোকে ক্ষমা কর্‌লুম, কিন্তু একটা পরামর্শ দে দেখি।

পরামর্শ? বলেই বীরেশ তার চেয়ারটা নির্ম্মলের আরও কাছে টেনে এনে বল্লে, পরামর্শ আমি যা দোবো তা' একেবারে সেণ্ট-পার-সেণ্ট সাউণ্ড, বুঝলে দাদা!

নির্ম্মল আরম্ভ করলে, পাগলামী না করে বেশ

মনোযোগ দিয়ে শোন্। রেখা বিয়ে করতে চায় না, কী করে তাকে বিয়ে করতে রাজী করান যায় বল্‌ত' ?

কারণ কিছু বল্লে ?

না। বল্লে সে কুমারী থাক্‌তে চায়। আমার কিন্তু মনে হয় সে সলিলকে ভালবাসে।

ওঃ, সেই সলিলবাবু। সেই বোকা ভদ্রলোকটি ভালবাস্‌তে জানে আবার নাকি? আমি এমন ভালমানুষ বোকা লোক কখন দেখিনি।

হ্যাঁ, ভালমানুষই বটে! বক ধার্ম্মিকের দল! বলে নির্ম্মল মুখে একটা কী রকম শব্দ করলে।

চুরুট দাঁতের ওপরে রেখে আস্তীনটা গুটিয়ে বীরেশ বল্লে, দেখ দাদা, রেখা ঠিক বলেচে, কুমারী থাকাই ঠিক। সে যে আজকালকার ইণ্টেলেক্‌চুয়ালিজম্‌-এর খানিকটা অংশ গ্রহণ করেচে এতে আমি আনন্দিত হলুম।

নির্ম্মল দেখ্‌লে তার সমস্যার সমাধান বোধ হয় বীরেশের দ্বারা হবে না। তবুও বল্লে, কুমারী থাকাটা যে ঠিক, তার যুক্তি ?

বিয়েটাকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করি না,

ভালবাসাকে মনে করি স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ, প্রেমকে মনে করি প্রতারণা।

অর্থাৎ ?

বিয়ে করলেই নিজেকে ছোট করে ফেলা হলো। আর একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মুক্ত অবাধ গতিকে বাধা দিলে। ভালবাসায় স্বাধীনতা নেই। আমার প্রিয়া বা প্রিয় কথায় কথায় কী ভাববে, আমার প্রত্যেক আচরণে তার কী মনে হবে এই আশঙ্কায় প্রাণে আনন্দ থাকেনা, সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। সেইজন্যে এই বুদ্ধিবৃত্তির যুগে মানুষ আর ভালবাসতে চায় না। যে ক'টা লোক আজ এই যুগে বড় তাদের মধ্যে একজনও ভালবেসে বিয়ে করে নি। আমি ত' ঐ ভয়ে মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌তে চাই না, পাছে ভালবেসে নিজেকে পরাধীন করে ফেলি।

নির্ম্মল হেসে বল্লে, তোর অত বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। সাধারণের জগতে নেমে আয়। আচ্ছা, যদি সলিলকেই রেখা বিয়ে করতে চায়, তাহলে কী করা যাবে? পাত্র হিসেবে ওর ত' কোন দামই নেই, যখন ওর এক কাণাকড়িও নেই।

কিন্তু সলিল কি রেখাকে ভালবাসে?

নিশ্চয়ই বাসে, তা' নাহলে রেখা কি অত ছেলেমানুষী করৃত।

চুরুটের ছাইটা ঝাড়্তে ঝাড়্তে বীরেশ বল্লে, না, পুরুষের ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না। পুরুষ এখন নারীকে ভালবাসে না, তাকে জয় করতে চায়। জীবনের পথে চল্তে চল্তে যাকে দেখ্লে পাওয়া সহজ নয় তাকে চায় পেতে, যে করে পারে! এইজন্যে সে কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, নারীর চিত্তকে যে করে হোক হরণ করবার ইচ্ছেয়। সে যত পারে ছোট হয়, যত ইচ্ছে কাঁদে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকে জয়। হয়ত' এজন্যে তাকে অনেক দুঃখ ভোগও করতে হয়, হয়ত' এজন্যে সে অনেক কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু তাকে পাওয়া চাইই। এটাই হচে তার অন্তরের ইতিহাস! ভাল যদি বাসৃত, তাহলে অত পাবার আশা করৃত না। তারপর যখন জয় হয়ে যায়, তখন আর সে তাকে খেয়াল করে না, সে হয়েচে অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মনের এক গোপন কোণে পেয়েচে সে আশ্রয়। তারপরে তার ভালবাসা গেল একেবারে মরে, বয়েস ধীরে ধীরে বেড়ে আসৃতে লাগ্লো, মানুষ তখন কিছুতেই শান্তি না পেয়ে সৃষ্টি সুরু করে। এই সৃষ্টিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, এইখানেই তার চরম বিকাশ।

তাই জন্যে বল্‌চি দাদা, পুরুষের ভালবাসার দাম নেই।

ভালবাসবার যুগের ছেলে নির্ম্মল নয়, অতএব ভালবাসার দাম থাক আর নাই থাক সলিলের সঙ্গে রেখার বিয়ে দিতে নির্ম্মল এতটুকু রাজী নয়! তাই বল্লে, সলিলের সঙ্গে ওকে ত' বিয়ে দোবই না। কিন্তু বিয়ে আমার ওকে দিতেই হবে, তা' নাহলে আমি শান্তি পাব না।

কেন দিতে হবে? দেওয়ার পেছনে যুক্তি কোথায়?

ছাখ্, মেয়েদের শেষ আদর্শ হচ্চে মাতৃত্ব।

বীরেশ হো হো করে হেসে উঠল। বল্লে, এইটেই কি নারীজীবনের সার্থকতা? এতদিন এরই জন্যে বহু নারী পেয়েচে অসহনীয় বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা, পীড়া। এটা একটা নিছক ভূয়ো জিনিষ, একেবারে অর্থহীন। 'মাতৃত্ব' 'মাতৃত্ব' করে চিরকাল চেঁচিয়ে আসা হয়েচে বলে আজ নারীরা কেবল জান্‌তে শিখেচে মাতৃত্বেই তাদের পূর্ণ পরিণতি। আমার মনে হয় আজকালকার এই যুগে মেয়েরা ধীরে ধীরে এ মত বদ্‌লাবে।

তবে মেয়েদের আদর্শ কী হবে?

তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বাধীনতা, অবাধ স্বাধীনতা।

তাহলে ত' সমস্ত বিশ্বজগৎ ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বার হয়ে দাঁড়াবে, বলে নির্ম্মল হাসলে। হেসে বল্লে, তোমাদের মত তোমাদের কাছে থাক্, এবং থাক্ ও বইয়ের পাতায়, তোমার নোটবুকে। তোমাদের পথে যাবার লোক মিল্‌বে না এই যা!

মিল্‌বে মিল্‌বে, একদিনে মিল্‌বে না, দু'দিনে মিল্‌বে না, কিন্তু একদিন মিল্‌বেই মিল্‌বে। প্রাইভেট চেম্বার বলে তুমি যে দেহের প্রয়োজনের কথার উল্লেখ করচ সেটাও একেবারে কল্পিত। আধুনিক মেয়েরা খেলায় ধূলোয়, লেখায়-পড়ায়, দেশকে বড় করবার চিন্তায় এমন ভাবে মশ্‌গুল থাকবে যে দেহের ঐ প্রয়োজনটার কথা তার মনে একবারের জন্যেও উঠ্‌বে না! সাব্‌লিমেশন কথাটা শুনেচ দাদা, Sublimation? শোন তবে বলি, এ নিয়ে একখানা বই লেখা যায়!

নির্ম্মল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়্‌ল। বীরেশের সঙ্গে গল্প করে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে এসেছিল। বল্লে, সব একদিনে বল্লে মনে থাক্‌বে কেন, কালকে আবার বলিস্। এখন একটা কথা শোন্। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, একটা

কাজ আছে। তুইত' রেখার চেয়ে একটু বড় মাত্র, রেখাকে বিয়ের জন্যে একটু বুঝিয়ে বল্‌গে যা। সলিলকে ছাড়া যাতে অন্য কাউকে বিয়ে করে এমন ভাবে বল্‌বি, তা' ছাড়া সলিলের নাম সেখানে খবরদার বলিস্‌ নি। যা, বলে বীরেশকে একরকম ঠেলে-ঠুলে পাঠিয়ে দিলে।

বীরেশ কিন্তু প্রথমেই গেল না। অন্য একটা ঘরে কিছুক্ষণ ভেবে নিলে কী ভাবে সে কথাটা পাড়্‌বে এবং তার যে কুমারী থাকা উচিত নয়, বিয়ে করা যে নিতান্ত উচিত এটাই বা দেখাবে কী করে! কিন্তু তার কথাগুলো যে অসংলগ্ন ঠেক্‌বে। তার দাদাকে যা সব বলে এল, তারই বিরুদ্ধে অনেকটা যুক্তি দিতে হবে। হ্যাঁ, অত ভাবে না, সভ্যতা ও শিক্ষার প্রথম গুণই হচ্ছে যতদূর সম্ভব কথার আর আচরণের মিল না রাখা। সে ধীরে ধীরে রেখার কাছে এল। রেখা তখন শোফায় হেলান দিয়ে ভিজে চুলগুলো মাথার দিক থেকে বুকের ওপরে এনে একটা বই পড়্‌ছিল, বীরেশ ঢুক্‌তে উদাসীন ভাবে বল্লে, বীরেশদা', কী মনে করে হটাৎ?

বীরেশ টেবিলের ওপরে বসে বল্লে, এমনি এলুম! তারপরে একটু চুপ করে বল্লে, কেন, আস্‌তে নেই?

রেখা মৃদু হেসে বল্লে, তুমি ত' বড় একটা আস না, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

ঠিক বলেচ, বলে বীরেশ টেবিলটার ওপর থেকে নেমে একটা বেতের মোড়ার ওপরে বস্‌লো। বল্লে, বাস্তবিকই কাজ ছাড়া আমি এক পাও নড়ি না। এখানেও এসেচি কাজে।

রেখা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার আবার কী কাজ!

রেখা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, বীরেশের মুখে কাজের কথা শুনে। বীরেশ সব করতে পারে এই কাজ জিনিষটা ছাড়া, একথা সকলেই জান্‌ত।

রেখার দিকে চোখ রেখে মুখে একটু হাসির আভাস এনে বীরেশ বল্লে, দাদা ডেকে পাঠিয়েছিল, বলে দিয়েছিল সে একা সব পেরে উঠবে না, বিয়ের হাঙ্গামা আমাকেও একটু নিতে হবে।

রেখা চমকে উঠ্‌ল, বল্লে, কার বিয়ে!

মনে মনে হেসে বীরেশ বল্লে, এ বাড়ীতে ক'জন কুমারী মেয়ে আছে?

সামান্য একটু আরক্ত হয়ে রেখা বল্লে, ও, আমার বিয়ে! তারপরে একটু থেমে বল্লে, কিন্তু

দাদা কি জানেন না যে আমি বিয়ে করব না। বিয়ের আসর থেকে উঠে গেলেই কি তোমাদের মান থাকবে ?

বেশ দৃঢ় সংযত স্বরে রেখা কথাগুলো বল্লে।

বীরেশ হেসে বল্লে, তুমি চিরকুমারী থাকবার জন্যে ব্রত নিয়েচ নাকি ?

মৃদু হেসে রেখা বল্লে, যদি বলি, হ্যাঁ।

তাহলে বল্‌ব তোমার এত শিক্ষা দীক্ষা থাকা সত্ত্বেও তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান বলে জিনিষ হয়নি।

কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য আবার কার প্রতি ?

আর কারু প্রতি না'হোক দেশের প্রতি, জাতির প্রতি।

আমি কুমারী থেকে দেশের জন্যে যদি আত্মত্যাগ করি তাহলেই আমার কর্ত্তব্য পালন করা হবে বলেই মনে করি।

কিন্তু সে মনে করাটাত' ভুল হতে পারে। যদিও তোমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে অনেক কথাই কইতে পারি না, তাহলে একথা আমাকে বল্‌তেই হবে যে জাতির প্রতি মেয়েদের এটা কর্ত্তব্য যে উপযুক্ত সন্তানের মা হওয়া। আমাদের দেশে মেয়েদের উপযুক্ত বর খুঁজে

দেয়, তার কারণ সবল সুস্থ সন্তানের জন্যে, আর কিছু নয়।

রেখা আরক্ত মুখে বসে রইল। কোন কথা কইলে না। বীরেশ ভাব্‌লে তার কথাটা হয়ত' কিছু কাজ করচে।

একটু চুপ করে থেকে মুখ আনত করে রেখা বল্লে, কিন্তু আমি যদি বলি আমি কাউকে ভালবাসি এবং আমি তাকেই বিয়ে করতে চাই।

ভালবাসা! বীরেশ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। বল্লে, এই প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির যুগেও কথাটা আজও বেঁচে আছে কী করে!

রেখা বীরেশকে বড় একটা দেখ্‌তে পারত না, বিশেষ করে তার প্রতি রেখার মনটা তিক্ত বিষাক্ত হয়েছিল সে দিন থেকে যেদিন সে নির্ম্মলের অসুখ হওয়াতে বাড়ী পালায়। রেখার কাছে ভালবাসা অতি পবিত্র জিনিষ, তাকেই এমন তাচ্ছিল্য করাতে বীরেশের প্রতি রেখার আরও বিতৃষ্ণা জেগে উঠ্‌ল।

বীরেশ তবু বলে যেতে লাগ্‌ল, ভালবাসা আর মোহ একই জিনিষ। ভিন্ন নাম দিলেই আর জিনিষটা ভিন্ন হয়ে যায় না। তোমার ভালবাসা আজ সত্যি হতে

পারে, কিন্তু কাল ত' এ না থাকৃতে পারে। জ্বরটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জ্বরই, তারপরে সেটা কমেও যায়, ছেড়েও যায়। দু'দিন বাদে এ মোহ কেটে গেলেই দাদার মতে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি থাকৃতে পারে না।

রেখা বুঝলে যে দাদার দূত হয়ে বীরেশ তার কাছে এসেছে। একটু ম্লান হেসে বল্লে, কিন্তু অনেক জ্বর আছে মানুষকে মেরে তবে ছাড়ে। জান না বোধ হয়?

রেখা আর কথা না বলে উদ্গত অশ্রু গোপন করৃতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্নেহ

সলিলের মা ছিল না তা পূর্ব্বেই বলেছি এবং এও বলেছি যে তার মাকে সে যা ভালবাস্‌ত তা' বড় সাধারণত দেখা যায় না। মাও তাকে ভালবাস্‌ত এবং সেত' বাস্‌বেই। মার পক্ষে ছেলের প্রতি ভালবাসা কিছু আশ্চর্য্য নয়, নূতনও নয়। কিন্তু সলিলের একটী ছোট বোন ছিল, সে কথা বলা হয় নি। এই ছোট বোনটির বিয়ে হয়েছিল কল্‌কাতা থেকে বহুদূরে, তাই সর্ব্বদাই তার খোঁজ খবর নেওয়া সলিলের ইচ্ছে থাক্‌লেও ক্ষমতায় কুলোয়নি, কিন্তু যেদিন অকস্মাৎ এই বোনটীর মৃত্যু সংবাদ তার কাণে এসে পৌঁছল সেদিন সে ক্ষণেকের জন্যে বিচলিত হলেও পর মুহূর্ত্তেই চঞ্চল মনকে দৃঢ় সংযত করে ফেল্লে। উপলব্ধি করলে, সে বড় একা!

মানুষের সেইদিন বড় দুর্দ্দিন যেদিন সে বুঝতে পারে তার ভালবাস্‌বার কেউ নেই। তাকেও কেউ ভালবাসে না, সেও কাউকে ভালবাসে না এমন একটা জীবনের অবস্থাকে কল্পনা করতে ভয় হয়, প্রাণ

শিউরে ওঠে। যদি মনের ভাবের ঘরটাকে একেবারে ভেঙে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে মনের এমনি অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, কিন্তু মানুষ যতদিন মানুষ থাক্‌বে ততদিন মনের ভাবগুলো তাড়ান কি যাবে? তাই সলিল পারছে না, সে ত' চেষ্টা করছে ভাবতে বেশ আছে, কিন্তু পারছে কই? এত বড় বিশাল বিশ্ব অথচ সে নিতান্ত একা, নিতান্ত অসহায়। মানুষের মনের এমনি অবস্থায়, বোঝা যায় বুঝি বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে। জগতের সমস্ত আমোদ-প্রমোদ হাসি আনন্দ কিছুরই বুঝি কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। জীবনের সুরটা আবার ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আন্‌তে হলে এমনি দিনে প্রয়োজন হয় তেমনি ধারা স্নেহ! কিন্তু সলিলের তা' কোথায়! বুক তার এতটুকু স্নেহ-স্পর্শ পাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে, প্রাণ তার চায় একটী স্নেহ-সুকোমল মুখকে জড়িয়ে ধরতে। এতটুকু ভালবাসা, এতটুকু স্নেহের জন্যে সমস্ত প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, কিন্তু কোথায়, কে দেবে! ভিক্ষুক, অতি ভিক্ষুক সলিল। প্রাণ তার সমস্ত বিশ্বের দিকে চেয়ে চেয়ে ভিক্ষা চাইছে, এতটুকু ভালবাসা, এতটুকু স্নেহ তাকে কি

কেউ দেবে না। হটাৎ সলিলের মনে হল রেখার কথা! ঠিক হয়েছে! রেখা আছে, রেখা ত' আজও তাকে ত্যাগ করেনি। অস্ফুট স্বরে বলে উঠ্‌ল, রেখা, রেখা!

কাপড় জামা পরে বেরোতে যাবে, এমন সময় তার পুস্তকের প্রকাশক এসে উপস্থিত হলেন। সলিলের আর যাওয়া হলো না, বসে পড়ল।

পুস্তক প্রকাশকটী ঘরে ঢুকেই বল্লেন, এই যে সলিল বাবু, আপনাকে ত' রোজ খুঁজে যাচ্চি, কিছুতেই পাচ্চি না। আজ ভারি ধরে ফেলেচি। আপনার বেরোন হল না বলে বোধ হয় খুব দুঃখ হচ্চে?

বলে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রকাশকটী সলিলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সলিল এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলে না। অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থাকার পর বল্লে, দয়া করে আজ আপনি আমায় রেহাই দিন, আমি বড় ব্যস্ত আছি।

প্রকাশকটী হাসির উচ্চতা একটু বাড়িয়ে বলে উঠ্‌লেন, ব্যস্ত ত' আমরাও আছি মশাই। আগাম টাকা নিলেন অথচ বইয়ের কপি পেলুম না। ব্যাপার কী বলুন ত'?

সলিলের এ সমস্ত কথা তখন এতটুকু ভাল লাগ্‌ছে না! কাজ, অর্থ, লোকের সান্নিধ্য তার কাছে বিষের মত মনে হচ্ছে। সে এখন চায় এক ঝলক নদীর সুশীতল বাতাস, একটুখানি দরদ, এতটুকু স্নেহ! সলিল চুপ করে আছে দেখে প্রকাশকটী বল্লেন, কি, চুপ করে রইলেন যে! আমাকে যা হয় একটা উত্তর দিন!

সলিল বল্লে, দেখুন, আপনার কাছে আমি আর মাত্র সাতদিনের সময় চাইচি, দয়া করে এই সময়টুকু দিন, আপনার বই ঐ সময়ের মধ্যে দেবোই দেবো। কারণ, আমার একটী ছোট বোন সম্প্রতি মারা গেছে। আমার কেউ আপন বল্‌তে ছিল না, ছিলুম কেবল আমরা এই দু'জন। ব্যথাটা আমার তাই একটু বেশী লেগেচে, আমি মনস্থির করতে পারচি না। তা' নাহলে আমার ইচ্ছেও নয়, প্রকৃতিও নয় কাউকে ঠকাব!

সলিল বোধ হয় বুঝতে পারছে না যে, জগতের সঙ্গে যেখানেই এতটুকু অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেখানে স্নেহ, মমতা, করুণা এসব আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নয়।

প্রকাশকটী সলিলের মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বল্লেন, ও, 'তাত' জানতুম না। বড় দুঃখের কথা, বড় দুঃখের কথা! বলেই প্রকাশকটী বেরিয়ে গেলেন।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোখের জল নিবারণ করে সলিল বিছানাটাই পরম প্রিয় ভেবে তাকেই আশ্রয় করলে। কাকেও অভিসম্পাত দিলে না, কাকেও কোনো দোষে অভিযুক্ত করলে না, কেবল পৃথিবী অতি সুন্দর, এই ভেবে চুপ করে রইল।

সতের

সলিল যখন শুয়ে শুয়ে ভাগ্যের পায়ে নিজেকে এমনিধারা বলিদান দিচ্ছে, তেমনি সময়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদছে রেখা। কাঁদ্তে কাঁদ্তে রেখা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল, কে যেন তার কাণে কাণে বলে গেল, রেখা, রেখা! এ যে সলিলের গলা, কত করুণ, কত ভারাক্রান্ত! রেখার চমক ভাঙল। ভাবলে, কেন তার আজ এ রকম মনে হচ্ছে! কেন তার সমস্ত অন্তরাত্মা এমনিধারা কেঁদে উঠ্‌ছে সলিলের জন্যে! ভাবলে, কি ভ্রম! তার কিছু শিক্ষা দীক্ষা থাকতেও কেন সে এমনিতর অধীর হচ্ছে। মনকে রেখা বোঝাতে চাইলে, কিন্তু মন কিছুতেই বাগ মান্‌লে না, সে সলিলকে দেখতে চায়; সলিল যে তাকে ডাক্‌ছে, বড় দুঃখে, বড় কাতর প্রাণে!

রেখা ভুল করে নি। সত্যিই ত' সলিল তাকে ডাক্‌ছে। আজ আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা ত' সত্যি বলে প্রচার করেছে যে, মানুষের সঙ্গে পরস্পর একটা

গভীর যোগসূত্র আছে। অতএব দূরে বসে কেউ যদি প্রাণে মনে কাউকে কিছু জানাতে চায়, তা' সে জানাতে পারে তার এই মনের শক্তির জোরে। তাই রেখার মনের চাঞ্চল্যটাকে আমরা নিতান্ত ভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। মনের যে কতখানি শক্তি আছে তা' আজও বিজ্ঞান সব খুলে বল্‌তে পারে নি, একদিন সমস্ত পরিষ্কার করে দিতে পার্‌বে, সেদিন আর এসব ব্যাপারকে ভ্রম বলে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না।

রেখা সামান্য একটু বেশ পরিবর্ত্তন করে নিলে। তার দাদা কী একটা কাজে একদিনের জন্যে বাইরে গেছে, তাই রক্ষে; তা' নাহলে দাদাকে ফাঁকি দিয়ে সে কখনই বাইরে যেতে পারত না, দাদাও হয়ত' সঙ্গে যেত। হাতব্যাগটা নিয়ে একটা শ্লীপার পায়ে দিয়ে চাকরকে বল্লে, আমি মার্কেট থেকে একটু আস্‌চি; কেউ এলে বস্‌তে বলো।

চাকরটা তবু বল্লে, দিদিমণি, গাড়ী বার করে দিতে বল্‌বো কি?

না, দরকার নেই পেট্রোল খরচ করে, বাসেই ঘুরে আসি।

রেখা বেরিয়ে পড়ল। রেখা খুব বেশী একটা

বেরোয় না। জানবার মধ্যে তার নিউ মার্কেট আর দু' একটা সিনেমা জানা আছে; আর সে বড় কিছুই জানে না। উত্তর কল্‌কাতায় গলির ভেতরে মেস খুঁজে নেওয়া সম্ভব হবে কিনা সে তা' বার বার ভাবলে। কিন্তু চাকরদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। যদি সলিলের বাড়ীতে মেয়েমানুষও থাক্‌ত, তাহলেও সে বল্‌তে পারত যে, তার কোনও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছে, কিন্তু সলিল যে থাকে মেসে! তবু তাকে চল্‌তে হলো। তার মনের চাঞ্চল্য তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লো।

বাস-কণ্ডাক্‌টার তাকে যে জায়গায় নামিয়ে দিলে সেখানে দাঁড়িয়েই দেখ্‌তে পেলে, সলিল যে গলিতে থাকে ঠিক সেই গলির মোড়েই তাকে নামিয়ে দিয়েছে। বার নম্বর বাড়ীটা খুঁজে নিতে তাকে বেশী বেগ পেতে হলো না। প্রথমে বাড়ীতে ঢুক্‌তে তার সঙ্কোচ বোধ হল, একদল অপরিচিত পুরুষের মধ্যে সে যাবে কী করে। ভাগ্যিস্ সন্ধ্যে, তাই কতকটা সুবিধে, মেসের অনেক লোক বেরিয়ে গেছে, কেউ মার্চ্চেন্ট আফিসে কাজ করে, এখনও ফেরেনি। রেখা দৃঢ়পদে সোজা গিয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে সলিলের ঘর কোন্‌টা।

ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন ?

ঠাকুর সামান্য একটু বিস্মিত হয়েছিল।

রেখা দ্রুত উত্তর দিলে, আমি তার এক আত্মীয়া, বাইরে থাকি, কল্‌কাতায় এলে এখানে খোঁজ পাব লিখেছিলেন ; তিনি এখানেই থাকেন ত' ?

ঠাকুরের বিস্ময় ভাবটা কতকটা কেটে গেল। সলিলের ঘরটা বলে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলে।

সলিলের ঘরের কাছে এসে রেখা দেখ্‌লে সলিল মাথায় একটা হাত দিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। ঘরটায় একটা দৈন্যের আর চাপা দুঃখের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রেখার চোখ পড়ল, তার ছবিটার ওপর। চোখের জল নিঃশব্দে মুছে ফেলে বাইরে জুতো ছেড়ে রেখা ধীরপদে সলিলের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। সলিলের শিয়রের কাছে বসে তার স্নেহ সুকোমল একটী হাত প্রিয়তমের কপালে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি অসুখ করেচে ?

সলিল ঘুমোয় নি, তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল মাত্র। চমকে উঠে বল্লে, কে ? চিরবাঞ্ছিত প্রিয়জনকে সুমুখে দেখে সলিল নির্ব্বাক হয়ে গেল। তার মনে তখন একসঙ্গে

আনন্দ ও বেদনার ঢেউ উঠেছে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে, রেখা, এখানে কেন! কেন, কেন এখানে এসেচ! বলে যেন অনেকটা চীৎকার করে উঠ্‌ল।

রেখা সলিলের এই চাঞ্চল্য দেখে একটুও বিচলিত না হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোচ্ছ, তোমার কি অসুখ করেচে?

না না, সুখও নেই, অসুখও নেই, কিন্তু তুমি কী করেচ তা একবার ভেবে দেখ্‌চ না। ছি ছি, তুমি এত ছেলেমানুষ। বলে সলিল ক্ষিপ্রপদে রেখার জুতো দু'টো নিজে হাতে ঘরের বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। সলিলের এই ভাব দেখে রেখা সামান্য একটু শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল।

সলিল বকে যেতে লাগ্‌ল! তোমার এই গোপন অভিসার যখন ঘৃণিত কুৎসার আকার নিয়ে তোমাকে, আমাকে, তোমার দাদাকে মাটির সঙ্গে লুটিয়ে দেবে তখনকার কথাটা কি একটুও মনে হয় নি! এত বড় ভুল করলে কী বলে?

মুখ শুষ্ক পাংশু করে রেখা বল্লে, তুমি দরজা বন্ধ করে ত' আরও ভুল করলে!

দরজা বন্ধ না করে উপায় কী? এটা মেস, কত লোক এধার দিয়ে যাবে; তখন যদি তারা দেখে তোমাকে আর আমাকে, একটা মেয়েকে আর একটা ছেলেকে একঘরে বসে থাকতে, তখন তাদের জিভ্‌কে ঠেকাবে কী দিয়ে?

রেখা শিউরে উঠ্‌ল, মনে মনে বেশ শঙ্কা অনুভব করলে। তবু সাহস সঞ্চয় করে বল্লে, মিথ্যে বেশীদিন বাঁচে না।

বাঁচে, বাঁচে! ভুলে যেও না, তোমাকে সমাজের ভেতরে বাস করতে হবে, সমাজকে তোমার প্রত্যেকটী কাজে চাই-ই চাই। সে যাকে সত্যি বলে মেনে নেবে, তোমার কাছে তা মিথ্যে হলেও তাই সত্যি। মানুষ আর সমাজ যদি বিভিন্ন হয়ে থাক্‌তে পারে, তবেই তোমার যুক্তি খাট্‌বে, নতুবা নয়।

কেন, তুমি ত' আছ; তুমিও কি আমায় ছাড়বে?

তুমি ভুল বুঝচ, তোমার জন্যে সমস্ত দুর্ণাম মাথা পেতে নেবার শক্তি আমার আছে, সমাজের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি আছে; কিন্তু তোমার দাদা কি তাহলে তোমার এই ব্যাপারে ধীরে ধীরে মরে যাবেন না! তাঁকে তুমি বাঁচাবে কী করে?

দাদা এ মিথ্যে বিশ্বাস করবেন না।

সলিল গম্ভীর হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বেশ শান্ত ভাব এনে বল্লে, দেখ রেখা, মানুষকে বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করে ঠোকো, কিন্তু বিচার করো না। মানুষকে বিচার করা কোনদিন ঠিক হয় না। কিন্তু আর নয়, লক্ষ্মীটী তুমি যাও, বরঞ্চ আমি তোমার সঙ্গে আর একদিন দেখা করে তোমার দাদার জুতো খেয়ে আস্‌ব সেও ভালো, কিন্তু তবু তুমি এখনি যাও।

রেখা তখনও উঠ্‌ল না। তাকে দেখে মনে হয়, যে চাঞ্চল্য সলিলের মনকে নাড়া দিয়েছে সে চাঞ্চল্য রেখার মনকে নাড়া দিতে এতটুকু সমর্থ হয় নি। সলিলের মাথায় আবার হাত দয়ে বল্লে, কিন্তু তুমি বলো, তোমার অসুখ করেনি ত'? আমার যেন মনে হলো তোমার ভয়ানক অসুখ করেচে, তুমি আমায় ডাক্‌চ, তাইত' আমি না এসে পারলুম না।

হটাৎ রেখার হাত দুটো ধরে সলিল তার নিজের কপালে মুখে বুলোতে বুলোতে বল্লে, বড় ডাক্‌ছিলুম রেখা, বড় ডাক্‌ছিলুম, সেই ডাক তুমি যে শুনতে পেয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে ছুটে এসেচ এর দাম

আমার কাছে যত বড়ই হোক্, অন্য লোকের কাছে এক কাণা কড়িও নয়, সেত' তুমি বুঝতে পারচ, তবে আর দেরী করো না, তুমি যাও। বলে রেখার হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিয়ে রেখাকে জুতো পরে ঠিক হয়ে থাক্‌তে বল্লে। সলিল বেরিয়ে গেল। একটু পরে এসে বল্লে, তুমি সোজা চলে যাও, যাবার সময় মার্কেটে নেবে কিছু কিনে নিয়ে যেতে ভুলোন।

পাছে বাড়ীর চাকর বাকরেরা কিছু মনে করে এই জন্যে সলিলের এই সতর্কতা। রেখা একেবারে মুটে করে জিনিষ নিয়ে এসে হাজির হলো। চাকর সরকার কিছুই সন্দেহ করলে না।

রেখা চলে গেলে সলিল পায়চারী করতে করতে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, রেখা কী ছেলেমানুষ! সমাজের নিয়মগুলো ভাঙতে হলে কষ্ট পেতে হয়, অনেক সময় ফলও হয় না, কেন না সমাজের ভেতরে সে ভাবের সাড়া হয়ত' তখন আসে নি। সেইজন্যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক সমাজসংস্কারকের অনেক সংস্কার মাটিতে মারা গেল। তাই আগে প্রচার করতে হবে নুতন মত এবং যখন যুক্তির দ্বারা সমাজকে সেই

মতে ফিরোনো যাবে তখনই হবে কাজের সুরু, তা না হলে ঠক্‌তে হবে। আর যদি অগাধশক্তি সম্পন্ন রাজার মত ক্ষমতা পাওয়া যায় তাহলে প্রত্যেক বিরুদ্ধ মতবাদকে পায়ে মাড়িয়ে একার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। সলিল পূর্ব্ব উপায়ই অবলম্বন করে কাজ করচে তার সাহিত্যের ভেতর দিয়ে।

তবু সলিল রেখাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলে না তার প্রতি তার স্নেহ দেখে। মেয়েদের কাছে সব চেয়ে বড় ভয় কুৎসা। সেইটে মাথার ওপরে ঝুল্‌চে এ কতকটা জেনেও রেখা যে তার স্নেহাস্পদকে তার এই দুঃখের দিনে, বেদনার ক্ষণে আনন্দ দিতে এসেছিল, এই ভেবে সলিলের চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে উঠ্‌ল।

আঁধার

নির্ম্মল কিন্তু তবুও হাল ছাড়লে না। সলিলের সঙ্গে রেখার বিয়ে দিতে তার বেশী আপত্তি ছিল না তবুও যা আপত্তি ছিল তা একদিকে যেমন হাস্যকর অন্যদিকে তেমনি অযৌক্তিক। সলিলের অর্থ ছিল না। এ কারণটা নির্ম্মল খুব বেশী করে ভাবে নি। রেখাকে তার বাপ যা অর্থ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই অর্থের ওপরে সলিল ও রেখা এবং তাদের পুত্রকন্যা বেশ বসে কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারত'। কিন্তু নির্ম্মল অতি পুরাতনপন্থী। এ যুগে তার জন্মগ্রহণ অনেকটা একসঙ্গে পাঁচটা ছেলে প্রসব করার মতই প্রকৃতির একটা নুতন খেলা। কতকগুলো ছোট খাট ব্যাপারে সে নুতনপন্থীদের দলেই আছে। বাড়ীর মেয়ে যদি জুতো পরে, রাস্তায় খানিকটা একা বেড়িয়ে আসে তাতে তার রাগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে হিন্দুর পূজো আহ্নিক প্রভৃতি কাজগুলো বাতিল করা চলে না! সেও চাই। মেয়েকে বেশী বয়সে বিয়ে দিতে আপত্তি নেই, শিক্ষাও দিতে রাজী আছে;

কিন্তু বেশী বয়সের ও শিক্ষার গুণগুলো ও দোষগুলো যদি প্রকাশ হয় তা' সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়। সে বাঙালীই থাকৃতে চায়; কেবল একটু বিলিতি পালিশ করে। তা' নির্ম্মল যাই হোক্, কিন্তু সে অকপট ও সরল। তার মা-বাপের প্রতিও যেমন অকপট ভালবাসা ছিল, তার বোনের প্রতি তেমনি ধারা স্নেহ আছে। কিন্তু তার একটা দোষ আছে, সে একটু একগুঁয়ে। নিজের মতে সে যদি কাউকে চালাতে না পারে, তার ওপরে তার বড় রাগ হয়, নিজের ওপরেও অভিমান জন্মায়।

সলিলের সঙ্গে রেখার বিয়ে দিতে তার গভীর আপত্তি ছিল এই যে, সে সলিলকে দেখে এসেছে অনেকটা সরকার চাকরের মতন। কেবল সে ভদ্রলোক ও শিক্ষিত, এইজন্যেই তার প্রতি তার অসীম টান ছিল এবং বাড়ীর ছেলের মতই তাকে অনেক অধিকারও দিয়েছিল। তার হাতে তার বোনকে সঁপে দিতে তার মন কিছুতেই চাইছে না, তাকে সে ভগ্নী-পতি হিসেবে সম্বোধন করবে কী করে? আর তার ধারণা, সলিল বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে কখন মেশেনি বা রেখার মত রূপও সলিলের চোখে

কখনো পড়েনি। তাই রেখাকে পাবার ইচ্ছে সলিলের এত বেশী! তাই ভালবাসার একটা পবিত্র নাম দিয়ে সরলা রেখাকে সলিল বাঁধ্‌তে চায়।

রেখার প্রতি সলিলের প্রভুত্ব দেখে নির্ম্মলের মাঝে মাঝে রেখার ওপরে রাগ হয়! কেন রেখা সলিলকে বিশ্বাস করে! কী ভাবে যে চতুর সলিল রেখাকে একেবারে নিজের করে নিলে এইটেই সলিলের ভারী আশ্চর্য্য ঠেকে! সলিল সম্মোহন বিদ্যা জানে নাত'? কিংবা অন্য কিছু? সলিলের ওপরে তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ্‌ল। ভাবলে, এইবার সলিলকে গুণ্ডা দিয়ে মার খাইয়ে তবে ছাড়বে। ক্রমে সলিলের ওপরের রাগ এসে পড়ল রেখার প্রতি। কেন ও মেয়েটা অমন বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ল। তার ওপরে সে কথা বল্‌তে শিখেছে, এ যে স্বপ্নের চেয়ে অবাস্তব! এতটুকু মেয়ে রেখাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করে নির্ম্মল তাকে এতবড় করে তুলেছে, তাদের আর কেউ ছিল না বলে নির্ম্মল তার জীবনটা এই বোনটীকে নিয়ে মধুর করে তুলেছিল, সেই রেখা আজ তার এইরকম ভাবে প্রতিদান দিলে! নির্ম্মলের চোখে অশ্রুকণা জমা হয়ে উঠ্‌ল।

ধীরে সলিলের প্রতি নির্ম্মলের রাগ কমে আস্‌তে লাগ্‌ল, রেখার প্রতিও রাগ কমে গেল। নির্ম্মলের এখন রাগের সময় নয়, এখন তার কাজের সময়! রাগ আর কাজ দুটোই প্রায় বিরুদ্ধ জিনিষ, তাই সে ভগ্নীর মঙ্গলকামনা করতে লাগ্‌ল। একসময়ে হটাৎ তার মনে হল, সলিলের কাছে গিয়ে যদি বলে, ভাই, আমার বোনটীকে ফিরিয়ে দাও, তার পরিবর্ত্তে তোমার যা চাই, সব দেবো, তাহলেও কি সলিলের হৃদয় করুণায় গল্‌বে না! সলিল কি এত নির্ম্মম হতে পারবে! কিন্তু তার যেতে কি লজ্জায় মাথা লুটিয়ে পড়বে না! সলিলের কাছে ভিক্ষা চাইতে যেতে হবে তাকে, এও কি সম্ভব! না, যাবে না, যা হয় হোক, সে আর ভাববে না। বীরেশের কথা মনে হল। তাকে দিয়ে এ কাজ করালে ত' মন্দ হয় না। তাই দেখা যাক্, সে ছোকরাকে দিয়ে যদি কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

বীরেশের ডাক পড়ল। বীরেশ যখন এলো, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার অজ্ঞাতে রেখাও এসে দাঁড়াল দরজার পাশে, তার বিয়ের সম্বন্ধে দুই ভাইয়ের কী

কথা হয় শোনবার জন্যে! এইরকম ভাবে আড়ি পেতে শোনাটা হীন কাজ, এ কথাটা রেখার মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হলেও সে কিন্তু লোভ-সংবরণ করতে পারলে না। ওদের মতলবের ওপরে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাকেও ত' সেইভাবে জীবনের পথ বেছে নিতে হবে। যদি জানা যায় যে একটা দুর্জ্জয় ঝড় আস্‌ছে, তাহলে সাবধান হলে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়, এতে আর দোষ কী।

বীরেশকে কাছে বসিয়ে একটা হাত ধরে নির্ম্মল বল্লে, তোকে একটা কাজ করতে হবে ভাই, তুই ছাড়া আমার আর এখন কেউ নেই।

বীরেশ নির্ম্মলের হাতটা সরিয়ে বল্লে, কি তুমি কাঁদ্‌তে সুরু করলে! আমি তোমার ছোট ভাই, আমাকে যা আদেশ করবে, তাই করব। তবে যদি বলো আমি বড় বেশী তর্ক করি বা নূতন নূতন কথা বলি, সেটা আমার স্বভাব হয়ে গেছে। তবে আমার আইডিয়াগুলো তোমার ওপর দিয়ে না খাটিয়ে অন্য জায়গাতেই experiment করব। বল এখন কী করতে হবে?

নির্ম্মল তবু কম্পিত স্বরে বল্লে, গ্যাখ্, আমার

এখন আর কেউ নেই, রেখাও ছেড়েচে, তুই-ই এখন আমার একমাত্র আপনার জন।

বীরেশ বল্লে, তুমি বড় বেশী ভূমিকা আরম্ভ করলে। বল, কী করতে হবে?

তোকে একবার সলিলের মেসে যেতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বল্‌বি, রেখাকে যেন সে ছেড়ে দেয়। আমার নাম করে বল্‌বি যে তার প্রতি দয়া করে যেন রেখাকে আর তার মুঠোর ভেতরে না রাখে।

বীরেশ বল্লে, তুমি কী বল্‌চো পাগলের মত। রেখাকে কি ভুতে পেয়েচে যে সলিল ওঝা হয়ে ছেড়ে দেবে।

বীরেশ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

নির্ম্মলের মন তখন অন্য সুরে বাঁধা। তা' নাহলে তার এই ধরণের কথাতে সেও বোধ করি হেসে উঠ্‌ত।

নির্ম্মল বল্লে, না, হাস্‌বার কথা নয়! আমার মনে হয় সলিল কোনরকমে মেয়েটাকে বশ করেচে।

বীরেশ হেসে উত্তর দিলে, ভালবাসায় বোধ হয়!

তুই-ই ত' বলিস্ ভালবাসা প্রভৃতি জিনিষ মিথ্যে কথা!

সে ত' বলি দাদা, কিন্তু দেখ্‌চি একটু অন্যরকম! যাই হোক্‌, তোমার কাজ আমি করে দেবোই। একদিন সলিলের সঙ্গে দেখা করেই আসা যাক্‌ না, তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, বলে বীরেশ বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত রেখাও পালিয়ে গেল।

রেখা তার ঘরে চলে এল বটে কিন্তু মানুষের মত হেঁটে নয়, যন্ত্রচালিতের মত।

বীরেশ ও নির্ম্মলের সমস্ত কথোপকথন শুনে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। মানুষের বুঝি যত রকমের শাস্তি আছে, তার মধ্যে দোটানার মধ্যে পড়াটাই সবচেয়ে কষ্টকর! কাকে রাখবে, কাকে ছাড়বে! একজনকে রাখ্‌লে, আর একজন থাকে না, আর একজনকে ডাক্‌লে, আর একজন সরে যায়! উভয়েই নমস্য, উভয়েই মহান্‌ চরিত্রের লোক! তার দাদার এই অপরিসীম স্নেহ দেখে রেখার বুক উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌তে লাগ্‌ল, দাদা, এই ছোট বোনটীকে একটু কম করে ভালবাস্‌তে পারনি! কিন্তু নির্ম্মলের এ কী ভুল, এ কী মনুষ্য চরিত্রের অজ্ঞতা! সলিলকে একটা যাদুকর, একটা ঐন্দ্রজালিকের মত ভেবেছে। কিন্তু নির্ম্মল ত'

জানে না, যাতুকর সলিল নয়, সলিলের ভালবাসা! সেই ভালবাসাই যে রেখার চারিধারে, মনের কোণে কোণে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে রেখাকে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু নির্ম্মল অত ভাবে কেন, রেখা ত' তাকে অগ্রাহ্য করে সলিলকে নিয়ে কোনদিন চলে যাবে না! সে শুধু চায় কুমারী থাকতে, এটুকুও স্বাধীনতা তাকে দেবে . . তার দাদার কাছে এটুকু ভিক্ষা চায়, আর সে কিছু চায় না, তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, তাব সমস্ত হাসি আনন্দ সবের বিনিময়ে এইটুকু স্বাধীনতা সে চায়!

হোয়াইট-ওয়ে-লেড্‌ল'র দোকানের বিপরীত দিকের একটা মেড়োর দোকান থেকে চার আনা দামের একটা 'করোনা' সিগার ধরিয়ে বীরেশ সলিলের মেসে এসে উপস্থিত হল। কিছুক্ষণ হল সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে। সলিল খোলা জান্‌লাটার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় আকাশে কেমন ধীরে ধীরে তারা ফুটে উঠ্‌ছে, তাই দেখ্‌ছিল। ঘরে ঢুকেই বীরেশ বলে উঠ্‌ল, হ্যালো, sleeping or dreaming?

মুখ ফিরিয়েই সলিল তেমনি ধারা শুয়ে শুয়েই বল্লে, dreaming.

Of what?

Of the days to come!

যাক্, আমায় চিন্‌তে পারচেন বোধ হয়। সলিল এইবারে উঠে বসে বল্লে, কই না!

সলিল বীরেশকে নির্ম্মলের বাড়ীতে দু' চারবার দেখেছে! কিন্তু একটু দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় জেগে উঠ্‌ল বলেই ঐ উত্তর দিলে।

বীরেশ সুমুখের একটা চেয়ারে দুম্ করে বসে পড়ে বল্লে, রেখাকে চেনেন ত'?

সলিল একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, কোন রেখা?

মুখ অনেকটা বিকৃত করে বীরেশ উত্তর দিলে, নির্ম্মলবাবুর ভগ্নী রেখা। আশাকরি চিন্‌তে পেরেচেন?

সলিল সামান্য একটু মৃদু হেসে বল্লে, পেরেচি, আপনি নির্ম্মলবাবুর কাছ থেকেই আস্‌চেন?

বীরেশ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, আপনি ইচ্ছে করে ভুল বুঝচেন কেন? আমি এসেচি রেখার

কাছ থেকে, নির্ম্মলবাবুর কাছ থেকে নয়। আমি রেখার মাসতুত ভাই।

সলিল নমস্কার করলে। বীরেশও প্রতি-নমস্কার দিলে। চাকরটাকে ডেকে সলিল বীরেশের জন্যে চা আনতে আদেশ করলে।

বীরেশ বলতে আরম্ভ করলে; রেখা, আমাকে দু' একটা কথা আপনাকে বলতে পাঠিয়ে দিয়েচে। সে চিঠি লিখেই পাঠাত, কিন্তু পাছে আপনি ভুল বোঝেন, সেই জন্যে সে আমাকে অনুরোধ করলে আপনার কাছে এসে তার বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিতে।

সলিলের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। গলার স্বর যতদূর সম্ভব দৃঢ় করে বল্লে, রেখা যদি সত্যিই আপনাকে পাঠিয়ে থাকে কিছু বলবার জন্যে তাহলে রেখা খুব ভুল করেচে, আর সেই ভুল বুঝে আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। শোনাটা আমি অন্যায় বলে মনে করি! আমাকে মাপ করুন।

সলিল ভাবতে পারে না, কী করে কোনো শিক্ষিত মেয়ে তার ভাইয়ের মারফৎ তার ভালবাসার

পাত্রকে কোনো কথা জানাতে চায়। যদি এ ভালবাসাটা গোপন না হত, তাহলে ভাই এসে বোনের কথা অনেক সময় বল্লে কিছু খারাপ দেখায় না, কিন্তু যেখানে প্রেমটা অতি গোপন রয়েছে সেখানে এরকম করাটা যেন অতি নিম্নশ্রেণীর লোকের কুৎসিত প্রেমালাপের মত দেখায়! সলিলের মনে হল, যে প্রেম গোপনে এত সুন্দর ও মধুর ছিল, বীরেশকে বলে বুঝি সেই প্রেম কত কালো ও কুৎসিত হয়ে গেছে!

বীরেশ দেখ্‌লে সলিলকে সে যা ভেবেছিল তা নয়, সলিল বুদ্ধিমান ও শিক্ষাসম্পন্ন যুবক। তাকে বোকা ভেবে যে ভুল করেছিল, আর সে-ভুল সে করতে রাজী নয়। বীরেশ আরও দেখ্‌লে, সলিল খুব ভদ্র।

চাকরটা চা দিয়ে গেলে পর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বীরেশ বল্লে, নির্ম্মলদা'ও আজ আপনার কথা বল্‌ছিলেন!

সলিল কোনো কথা না ক'য়ে কেবল বীরেশের দিকে চেয়ে রইল।

বীরেশ বলে যেতে লাল, আচ্ছাগ সলিলবাবু,

রেখার সঙ্গে আপনার যদি বিয়ে হয় তা'হলে বেশ হয়, কিন্তু দাদার ত' মত নেই।

সলিল ছুটো হাত জোড় করে বল্লে, আমাকে মাপ করবেন, আমি এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

বীরেশ চুপ করে গেল। বল্লে, তাহলে আপনি আমাকে তাড়াতে চান?

আপনি যদি তাই ভেবে নেন, তাহলে আর কী করব বলুন। আমি কেবল বল্‌চি, রেখার সম্বন্ধে কোনো কথা আমি শুন্‌তে পারচি না। আপনি দয়া করে অন্য প্রসঙ্গের কথা পাড়তে পারেন ত'!

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছুক্ষণ বীরেশ সময় কাটিয়ে দিলে। তারপরে সলিলের মুখের দিকে চেয়ে একটু করুণস্বরে বল্লে, আচ্ছা সলিলবাবু, শুনেচি আপনি কিছু লেখেন-টেকেন। মানুষের চরিত্রের সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান আছে নিশ্চয়ই; দয়া করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেবেন?

সলিল মৃদু হেসে বল্লে, আমি লিখি বটে, তবে মনুষ্যচরিত্রের জ্ঞান আছে কি না বল্‌তে পারি না।

তবে আপনার কথাটা শুনলে আলোচনা করতে পারি মাত্র।

একটু ঢোক গিলে অন্যদিকে চেয়ে বীরেশ বল্লে, দেখুন সলিলবাবু, আমি একটী মেয়েকে কী ভালই না বাস্‌তুম। মেয়েটী আমাকে কত আশাই দিলে। তারপরে একদিন শুনলুম সে অন্য লোককে বিয়ে করে চলে গেছে। আচ্ছা, মেয়েদের ভালবাসার কোনো মূল্য নেই, না?

বীরেশের চতুরতা সলিল বুঝে মনে মনে হেসে বল্লে, যা আমরা ভালবাসা বলে মনে করি, সেটা অনেক সময়ই ভালবাসা নয়। ভালবাসা একটা মনের ভাব মাত্র। আর ভাবমাত্রেই ত' ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল। সেইজন্যে ভালবাসা জিনিষটা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই ক্ষণস্থায়ী ভালবাসাও ভালবাসা আর চিরস্থায়ী ভালবাসাও ভালবাসা। ভালবাসা তখনই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে, যখন জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার ইচ্ছে এই ভালবাসার ভেতর দিয়েই থাকে।

বাধা দিয়ে বীরেশ বল্লে, কিন্তু আর কোনো জিনিষের ভেতর দিয়ে কি জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে না?

কোথাও কোথাও ওঠে না তা নয়, তবে এমন মধুর ভাবে, এমন পরিপূর্ণ ভাবে নয়।

কিন্তু আপনার প্রতি রেখার ভালবাসাটা আমার মনে হয় ক্ষণস্থায়ী!

কথাটা বলে ফেলেই বীরেশের মনে হল, কি বিশ্রী ভাবেই না কথাটা বলা হয়েছে। অন্য রকম করে ঘুরিয়ে বল্লেই ত' হত! তাকে সলিল কী ভাবছে! ভাবছে নিশ্চয়ই সে কত অভদ্র, কত নীচ!

বীরেশ চায় রেখার প্রতি সলিলের অবিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে, তাতে যদি রেখাকে অত্যন্ত নীচু করে দিতে হয়, তাতেও সে এতটুকু পশ্চাৎপদ নয়। তার দৃষ্টি উদ্দেশ্যের প্রতি, উপায়ের দিকে নয়! তার উদ্দেশ্য ভাল হলেই হল। তবুও কথাটা ওভাবে বলার জন্যে তার মনে একটা খোঁচা লেগে রইল।

সলিল বীরেশের মনোভাব বুঝেছিল, তাই সে ও সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে এত নারাজ। সলিলের মনুষ্য চরিত্র বুঝতে বাকী নেই। সে ছেলে-মানুষ হলেও, জীবনের অভিজ্ঞতা তার অনেক

বয়সের। সে গম্ভীর হয়ে অন্য একদিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বীরেশ চলে গেলে সলিলের পুরানো একটা স্মৃতি হটাৎ মনে পড়ল। একদিন রেখা সলিলকে বলেছিলো, দেখ, এই বোধ হয় আমাদের শেষ, দেখা সাক্ষাৎ করা আর বোধ হয় আমাদের সম্ভব নয়।

সলিল উত্তর দিয়েছিল, তা জানি। চোরের মত আসা-যাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন তোমার আমার সাক্ষাৎও সম্ভব নয়। তারপরে একটু থেমে বলেছিল, কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী রেখা?

রেখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু হেসে বলেছিল, কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যাবে নাত'? একটা কথা আছে না, out of sight, out of mind.

সলিল উত্তর দিয়েছিল, মা যেমন ছেলেমরার শোক ভুলে যায়, তেমনি ধারাই ভুল্‌ব।

তারপরে দুটো হাত ধরে রেখা বলেছিল, প্রতিজ্ঞা করো, বলো, আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র না থাক্‌লেও আমাদের মনের ভাব আজও যেমনি আছে ঠিক তেমনি থাক্‌বে।

সলিল হেসেছিল, বলেছিল, আর কোনো যোগসূত্র না থাকে, মনের যোগসূত্র কাটবে কী করে। সেটা কোনোদিন ভুলো না।

সলিল আজ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগ্‌ল, সেই রেখার বিরুদ্ধে বীরেশ এসেছিল বল্‌তে। ওঃ, এরা কী হীন!

প্রেমিক প্রেমিকের ভেতরে বিদায়ের ক্ষণে এ ভাবের অনেক কথাবার্ত্তাই হয়, অনেক চোখের জল পড়ে, আবার বিচ্ছেদ হতেও বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সলিল ও রেখার চরিত্র অন্য ধাতুতে তৈরী। আর তাদের মনের ঐক্য ছিল বেশী, সেই ঐক্য ছিল বলেই তারা সফল হয়েছিল। রেখা যদি নীহারের মত হত, কিংবা সলিল যদি রাজা হত, তাহলে উভয়ে উভয়কে প্রথমে ভালবাস্‌লেও শেষ পর্য্যন্ত সে ভালবাসা টিক্‌ত না, সামান্য একটা ক্ষুদ্র কারণে বালির বাঁধের মতই সে ভালবাসা সমাধি লাভ করত। তাদের মন একসুরে বাঁধা ছিল বলেই যে তারা পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটায় নি তা নয়, তাদের এই ভালবাসার সুমুখে ছিল একটা আদর্শ যা তাদের উভয়কে এক করে দিয়েছিল।

উনিশ

আগুণ নিয়ে খেলা করা সোজা নয়, মণীষা মরল। তার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে গেল রাজার পায়ের তলায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাজা ঢুকতেই মণীষা বল্লে, তোমাকে আমার বিয়ে করতেই হবে, তা' না হলে এ লজ্জা ঢাক্‌ব কী দিয়ে?

গম্ভীর কণ্ঠে রাজা বল্লে, স্পষ্টই বল্‌চি, তা আমি পারব না। বল্লুম, ডাক্তারের কাছে চল, তখন তোমার মাতৃত্ব উথলে উঠ্‌ল। এত আধুনিক, আর বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে এত ভয়?

কেন, বিয়ে করলেই ত' সে হাঙ্গামা চুকে যায়। তুমি কি আমার দেহই চেয়েছিলে শুধু, ভাল কি একটুও বাস নি?

রাজা কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। পরে মাথাটা খাড়া ক [illegible] ল্লে, ভালবেসেছিলুম বৈকি। তোমাকে এত ভালবেসেছিলুম যে তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতুম। তারপর একটু হেসে

বল্লে, কিন্তু কর্ম্মকার তার যন্ত্রকে যতখানি ভালবাসে, তার বেশী নয়।

বাস্তবিকই রাজা মণীষকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তার মনকে নয়, দেহকে। তার ভালবাসার সুমুখে ছিল একটা উদ্দেশ্য, সেটা মণীষার লীলায়িত তরুণ দেহ। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে, সে অত্যন্ত প্র্যাকৃটিক্যাল ছিল। সূক্ষ্ম মনের চেয়ে স্থূল দেহটা যে ঢের বেশী সত্য জিনিষ, এটা যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং দর্শন-স্পর্শন যোগ্য, এ সে বেশ ভাল করেই জানৃত। ফিলসফির ছাত্রেরা মনটার অস্তিত্বকে দেহের চেয়ে সত্য বলে প্রমাণ করতে বসলে সে ওসব তর্কে যোগদান করা যুক্তি সঙ্গত মনে করত না। সে হয়ত' তখন কোন রূপসীর দেহ বিশ্লেষণে ব্যস্ত। সেই রাজা যখন মণীষার সুমুখে এত বড় একটা নিষ্ঠুর সত্য এত জোর গলায় বল্‌লে, মণীষার গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে মণীষা বল্‌লে, তুমি এত হীন, এত কাপুরুষ। একটা মেয়েকে বিপদে ফেলে সরে পড়তে চাইচ।

কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে রাজা বল্লে, আমি

হীনও নই, কাপুরুষ নই, আমি যাকে বলে একটু বুদ্ধিমান্। তুমি বিয়ের আগে এ ভাবে যখন দেহ দিতে পেরেচ, এতটুকু কুণ্ঠা হয়নি, তখন যে তুমি অন্য কোথাও দাওনি তারই বা প্রমাণ কী? আজ বিপদে পড়ে বিয়ের কথা বলচ, কিন্তু যদি এ বিপদ থেকে দৈবাৎ মুক্তি পেতে, তাহলে ত' তুমি নিশ্চয়ই অন্য লোককে বিয়ে করে ঘর সংসার করতে, ছেলে-পিলে হত, তাতে ত' তোমার সতীত্বে এতটুকু বাধ্‌ত না!

স্বর একটু বিকৃত করে মণীষা বল্লে, তোমরা কি তাহলে মেয়েদের সঙ্গে মিশে বেড়াও এই জন্যে?

নিশ্চয়ই, একশ' বার।

তাতে বুঝি তোমাদের সততায় বাধে না।

ওঃ, সততা। বলে রাজা কথাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দিলে। তারপরে বল্লে, ছেলেদের কাছে যা মার্জ্জনীয়, মেয়েদের কাছে তা নয়, বিশেষতঃ এই সব বিষয়ে। ছেলেদের দেহ-ধর্ম্ম মেয়েদের দেহ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। দেহটা আমার হাতে তুলে দেবার আগে তোমার যতখানি ভাবা উচিত ছিল, আমার ততখানি ছিল না। তবুও, আমার যা করবার ইচ্ছে ছিল,

তাতে যখন তুমি রাজী নও, তখন যা হয় করগে, আমার কী! বলেই লাফিয়ে দরজা খুলে চলে গেল।

মণীষা রাগে কাঁপছিল। কিন্তু রাজা পালিয়ে যেতে রাগ ভয়ে পরিণত হল। সে করুণ আর্ত্তনাদ করে উঠল। মণীষার মা সেই চীৎকারে ওপরে ওঠবার সময় রাজার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েচে বাবা?

মণি মাথা ঠুকে ভয়ানক কেটে ফেলেচে, বরফ আনতে যাচ্চি।

রাজার মোটরবাইক আশী মাইল বেগে বেরিয়ে গেল।

কুঁড়ি

সলিল যেদিন থেকে লিখতে সুরু করলে সেইদিন থেকে তার প্রায় বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধও ছিন্ন হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে লিখেই চলে, সকাল দুপুরে, দুপুর সন্ধ্যায় কখন যে গড়িয়ে যায় তা' তার খেয়াল থাকে না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সুসাহিত্যিক হিসেবে সকলের কাছে গণ্য হয়ে গেল। সে আধুনিক কালের দোষগুলো আধুনিকদেরই চোখ খুলে দেখাত, যারা প্রত্যেক' মন্দটাকে আধুনিকত্বের দোহাই দিয়ে প্রশ্রয় দিতে চাইত তাদের বিরুদ্ধেই সে তুলেছিল কলম। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠে বেশী অসৎ, মানুষের কুভাবগণের প্রসারণ হয় শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, কেন না মানুষের সুমুখে অনেক সুযোগ ও সুবিধে এসে পড়ে। বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে মানুষ অনেক পাপ কাজ করে যা অন্যযুগে অসম্ভব হয়ে উঠত।

শরতের সোনালী সকাল বেলায় রেখা তার শোবার

ঘরে একটা মোড়ায় বসে সলিলের একখানা বই পড়ছিল। বইটার এক জায়গায় এইরকম লেখা আছে।

"তুমি আমাকে ভুল্‌তে চেষ্টা কর, বুঝলে?"

"চেষ্টা করব, কিন্তু পারব কি?"

"কেন পারবে না, মা যদি ছেলে মরার দুঃখ কালে ভুলে যায়, তাহলে তুমিই বা আমাকে কেন ভুল্‌তে পারবে না?"

"ভুল কথা, মা কোনদিন ছেলে মরার দুঃখ ভোলে না, ভুলতে পারে না।"

"হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। জীবনে আমরা কোন ঘটনাই কোনদিন ভুলে যাই না, তবে সময়ে সেটা বেশ সুসহ হয়ে ওঠে, অন্ততঃ ভুলে যাবার মত করে আমরা জীবনের কাজ কর্ম্ম করতে পারি। যখন তোমার আমার মিলন কোনোরকমে হবার সম্ভাবনা নেই দেখছি, তখন কি মুখ ভার করে জগতের সমস্ত হাসি-আনন্দ-কোলাহল থেকে দূরে পড়ে থাক্‌তে হবে?"

"কিন্তু যদি আমি না-ভোলাতেই আনন্দ পাই।"

এই পর্য্যন্ত পড়ে রেখা চোখ মুদ্রিত করে কী

যেন ভাবতে লাগল, এমন সময় নির্ম্মল এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুই এত শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন বল্‌ত'?

একটু মৃদু হেসে রেখা বল্লে, তুমি দাদা আমাকে একটু কম করে ভালবাস্‌তে পার না। তোমার এ স্নেহের অত্যাচার আর আমি সইতে পারি না।

এর উত্তরে নির্ম্মল কী একটা বলতে গিয়ে রেখার হাতের বইটার ওপরে নজর পড়াতে বল্লে, এ খানা কী বই রে?

এ একটা উপন্যাস। বলে কথাটাকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে. তার ভয়, যদি দাদা সলিলের নাম দেখে, হয়ত, আবার গালাগাল দেবে। কিন্তু হলোও তাই। বইটা তুলে নির্ম্মল পাতা উল্টোতেই দেখতে পেলে সলিলের নাম।

নির্ম্মল গম্ভীর হয়ে বল্লে, শুনলুম আজকাল সে অনেক বস্তী-সাহিত্য গড়ে তুল্‌চে। তুই এসব বই পড়িস্ কেন?

বড় একটা পড়িনা, ওরা লাইব্রেরী থেকে এনে-ছিল, তাই দেখ্‌ছিলুম।

লাইব্রেরীতেই বা এসব বই রাখে কেন?

রেখা হেসে ফেল্লে, হেসে বল্লে, আমার ওপরে

অনর্থক রাগ করচ কেন? আমি ত' আর লাই-ব্রেরীয়ান নই

নির্ম্মলও হাস্‌তে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে গম্ভীর হয়ে নির্ম্মল বল্লে, সলিলের মত রাস্কেলও সাহিত্যিক হয়।

কিছুক্ষণের জন্য রেখা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে স্থির ও নির্ব্বাক। তারপরে হটাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দাদা, তুমি মানুষকে অত খারাপ ভাব কেন? তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি ওঁকে যথেষ্ট অপমান করেচ, আর তুমি করো না। তিনি আমাকে যথার্থ ভাল-বেসেছিলেন বলেই কি তাঁর এত কঠোর দণ্ড!

রেখার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তার রক্তিম গণ্ডোদ্বয়ে বন্যা নেমে এল।

সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এতবড় কঠোর আদেশ, অথচ এত স্নেহ-কোমল সুরে রেখার মুখ দিয়ে নির্ম্মল কোনদিন শোনেনি। রেখার এই বিশ বৎসরাধিক জীবনের মধ্যে সে এমনি ভাবে কোন কথা বলেনি। পাছে তার দাদার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রেখা সলিলের ওপরের অত্যাচারের এতটুকু প্রতিবাদ করেনি, নীরবে, মনের নিভৃত

অন্তরালে তার মন যে কেবল সলিলকেই পূজো করে এসেছে, তাকেই যে স্বামী বলে বহুদিন আগেই গ্রহণ করে নিয়েছে, তা নির্ম্মল এত ভাল করে জান্‌তে পারে নি। তার মনে পড়ল, তার আশঙ্কা তাহলে ঠিক। এই ছিল তার বিবাহ না করবার একমাত্র কারণ। জীবনে সলিলকেই কেন্দ্র করে সে তার দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছে। আজ বোধ হয় এতদিনকার সঞ্চিত সংযম আর কিছুতেই রোধ করতে পারলে না, মুখের ভাষায়, চোখের জলে সমস্ত পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। নিদারুণ সুদুঃসহ ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে নির্ম্মল বোধ করলে। আবার ভাবলে, আজ চার দিন হল নির্ম্মল কাগজে পড়েছিল যে সলিল মোটরের ধাক্কা লাগিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। যদি কিছু হয়, যদি এই আঘাত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এই অমঙ্গল আশঙ্কায় নির্ম্মলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রেখার কাছে তাহলে এর উত্তর দেবে কী! কী বলে রেখাকে বোঝাবে!

আরও মনে পড়ল, সলিল তার অসুখের সময় কী আপ্রাণ সেবা যত্নই না করেছিল, কিন্তু কী অকৃতজ্ঞ সে, তাকে সে কত অপমান করেছে! কিন্তু সলিলের

প্রতি এই ব্যবহারের পেছনে কি রেখার একমাত্র মঙ্গল কামনাই ছিল না?

চাকরকে বলে দিলে গাড়ী বার করতে। সোফার যেতে চাইলে, সঙ্গে নিলে না, নিজেই অদম্য বেগে মোটর চালিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট করবার আশঙ্কা নিয়ে পুলিশের নিবারণ হস্তকে অগ্রাহ্য করে মেডিকেল কলেজে এসে থাম্‌ল।

আহতের পাশে এসে নির্ম্মল দাঁড়াল।

সলিলের হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আঘাত খুব সাংঘাতিক নয়।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে নির্ম্মলকে দেখে সলিল হেসে বল্লে, নির্ম্মল-দা যে!

নিজেকে সংযত করে নির্ম্মল উত্তর দিলে; সলিল, তোমার ওপরে আমি যে অন্যায় করেছি, সে আমি কোনদিন ভুল্‌ব না। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই!

কী যে বলেন আপনি, বলে অন্যদিকে চাইলে।

নির্ম্মল নিজের অন্তরের সমস্ত ইতিহাস উন্মুক্ত করে দিয়ে বল্লে, আমাকে কথা দাও, তুমি রেখাকে বিয়ে করবে।

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সলিল বল্লে, দেখুন নির্ম্মল-দা, আপনি যা করেচেন এটাই স্বাভাবিক ; অন্য ব্যবহার আপনার কাছ থেকে যদি আমি পেতুম তাহলে বুঝতুম আপনি উপযুক্ত অভিভাবক হবার যোগ্য ন'ন।

কিন্তু তোমাকে আমি নির্দ্দয় ভাবে যে অপমান করেচি, সেটা ভুলে যাচ্চ কেন! আমার শিক্ষিত মন কেন যে এ করেছিল, তা আমি ঠিক বুঝতে পারচি না।

সলিল কিছু বল্লে না মুখে, মনে মনে বল্লে, দাদা, তোমার মত বোনকে ভালবাস্‌তে জীবনে কখন কাউকে দেখিনি, আর দেখব কি না তাও জানি না।

একুশ

চব্বিশ পরগণার এক বদ্ধিষ্ণু গ্রামে সলিলের একটা বাড়ী ছিল। বহুদিন পরে সে তার বাড়ীতে এসেছে। সে আর মেসে থাকে না। তার ক্ষত প্রায় সব শুকিয়ে এসেছে। গায়ে পায়ে একটু আধটু ব্যথা।

রেখা সলিলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, তোমার গায়ের ব্যথা আর নেই নিশ্চয়ই ?

সলিল হেসে বল্লে; না নেই, যা কিছু একটু আছে পায়ে বা গায়ে নয়, বুকে।

কণ্ঠস্বর মিষ্ট হতে মিষ্টতর করে সোহাগপূর্ণ স্বরে রেখা বল্লে, ঠাকুর, ওটুকু বিয়ের দিনেই সেরে যাবে।

এমন সময় সলিলের পরিচিত একজন ডাক্তার এসে হাজির হল। বল্লে, কি হে, কেমন আছ ?

রেখা সরে গিয়ে দূরে একটা চেয়ারে বসল।

রেখার স্থান দখল করলে ডাক্তার।

এই ডাক্তারটী সলিলের ছেলেবেলার বন্ধু। উভয়েই

দেশের স্কুলে এক সঙ্গে পড়াশুনা করে। পরে কলেজে পড়বার সময় উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়, আবার দেশে আসাতে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। ডাক্তার দেশেই প্র্যাক্‌টিস্ করে।

সলিল বল্লে, ভালই আছি।

ডাক্তার আশ্বাসের স্বরে বল্লে, আঘাত খুব বেশী হয় নি, একেইত' তুমি কত সংযত, কত সাবধানী লোক। তবে সেদিন বোধ হয় কোন বিশেষ কারণে চিন্তান্বিত ছিলে?

হয়ত' ছিলুম, বলে সলিল রেখার দিকে চেয়ে হাস্‌লে।

রেখা তখন একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা ছিঁড়ছিল।

ডাক্তার রেখাকে লক্ষ্য করে বল্‌লে, ইনি তোমার কে?

কে বলই না, বলে সলিল হাসলে।

আরে, বল বল, বড় কৌতূহল হচ্চে, তোমার বাড়ীতে মেয়ে মানুষ এ আমি ধারণা করতে পারি না।

সলিল হাসতে লাগল। রেখা চল্‌তি মাসের ক্যালেণ্ডারের পাতা পর্য্যন্ত ছিঁড়ে যেতে সুরু করলে।

ডাক্তার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে, বল্‌বে না উনি তোমার কে? আত্মীয় বুঝি ?

না, পরমাত্মীয়! বলে সলিল হেসে রেখার দিকে চাইলে। লজ্জায় রেখার চোখদুটো রাঙা হয়ে উঠ্‌চে।

বিশ্বাস হচ্চে না কিছু, বল, আর হেঁয়ালী করো না।

তবে ও আমার বাংলা করে যাকে বলে বউ—

কথাটা ফস্ করে বলে ফেলে সলিল ভাব্‌লে কথাটা বলা ঠিক হয়নি, তখনও সেখানে রেখা বসে আছে। সলিলের দিকে একটা সুমধুর, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেখা চোখ ফিরিয়ে নিলে।

ডাক্তার রেখার আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ কালো ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

তার গলা অত্যন্ত কঠোর হয়ে এল। সলিলকে বল্লে, কিন্তু ওঁর মাথায় সিঁদুর নেই কেন?

বিয়ে হয় নি বলে।

ডাক্তার লাফিয়ে উঠল, বল্লে, তবে আর বউ বলো না, বলো—

সলিল প্রায় উঠে বস্‌ল। ঘৃণায় বিরক্তিতে শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু পূর্ণ করে বল্লে, ছিঃ, ছিঃ, ডাক্তার। মেয়েদের যা তা ভাবা পাপ এবং তা প্রকাশ করা মহাপাপ। তুমি কী ভাব ডাক্তার, পুরোহিতের কাছে বসে কতকগুলো অবোধ্য মন্ত্র পড়লেই মিলনের পরাকাষ্ঠা দেখান যায়! নর নারীর যথার্থ ভালবাসাটা কি কিছুই নয়, সেটা কি এত হেয়, এত অশ্রদ্ধেয়!

ডাক্তার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, তাহলে কি বিয়ে না করে মিলন, Companionate marriage, কী বল?

রাগত সুরে সলিল বল্লে, না, না, তা আমি কোনদিন বলিনি। আমি বিয়ের বন্ধনকে অগ্রাহ্য করি না, সত্যকারের প্রাণের ভালবাসাকেও ঠেলি না। আমার কাছে দুয়েরই মূল্য আছে, এবং একটা আর একটার বিরোধীও নয়।

ডাক্তার সলিলের উষ্ণতা বড় গ্রাহ্য করলে না। তেমনি ধারা হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্লে, অর্থাৎ যদি কোনো মেয়েকে ভালবাসা যায়, তাহলে তাকে বিয়ে না করলেও চল্‌বে, এই না?

সলিল বড় একটা রাগ করতে পারে না বা জানে না। তার স্বভাবই ঐরকম। স্বর যথাসম্ভব সংযত

করে উত্তর দিলে, অনেকে এ কথা আজ বল্‌চে বটে, কিন্তু আমি তা' বলি না। বিয়ের উদ্দেশ্য পরস্পরের মধ্যে একটা বন্ধন, ভালবাসাও যদি সে বন্ধন আন্‌তে পারে তাহলে বিয়ের প্রয়োজন কী? এ মত অনেকের আছে। আমার মনে হয়, সাধারণক্ষেত্রে ভালবেসে বিয়ে করাই উচিত। ভালবাসাও চাই, বিয়েও চাই। হৃদয়ের ক্ষুধাও মেটে, আর সমাজ ও যুক্তির গায়েও আঘাত লাগে না। এতে ত' আর কারু আপত্তি থাকতে পারে না?

তর্কটা ব্যক্তিগত থেকে ক্রমে সমষ্টিগত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

ডাক্তার বল্লে, অনেকের আছে বৈ কি! তারা বল্‌বে বিয়েটার দরকার নেই। যদি ভালবাসা যায়, তাহলে শুষ্ক বন্ধনটা থেকে যাবে। অতএব অবিবাহিত থাক্‌লে পরস্পরের ভালবাসার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যাবে।

সলিল হেসে বল্লে, অতই যাদের মুক্তির আস্বাদ পাবার ইচ্ছে, তাদের ভালবাসার বন্ধনই বা থাকে কেন? না ভালবাস্‌লেই ত' হয়? আর যারা একথা বলে তারা ডিভোর্স প্রথার পক্ষপাতী।

ডাক্তার হাস্‌তে হাস্‌তে বিদ্রূপের সুরে বল্লে, না ভালবেসে কি থাকা যায়! ভালবাসা যে অন্ধ! প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসার গল্প শোনোনি?

সলিল গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে, তোমার কথা হয়ত' কতক পরিমাণে সত্যি। কিন্তু দীর্ঘ সহবাসের সঙ্গে সঙ্গেও কি একটা ভালবাসা গড়ে ওঠে না?

সলিলের একথা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দীর্ঘ সহবাসজনিত ভালবাসাকে অস্বীকার করা চলে না। মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে, যে বাড়ীতে বেশী দিন বাস করা যায় বা যে জিনিস বেশী দিন ব্যবহার করা হয় তাদের চির-বিচ্ছেদে মনে দুঃখ হয়। বিদেশে বহুদিন বাসের পরে বিদায়ের দিনে চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। অতএব দীর্ঘ সহবাসের ভালবাসাও মুহূর্ত্তের দৃষ্টিবিনিময়ের ভালবাসার চেয়ে নিতান্ত কম নয়, বরং বেশী।

ডাক্তার বল্লে, দীর্ঘ সহবাসেও যদি ভালবাসা গড়ে ওঠে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী আমরণ কলহ করে কী জন্যে?

এর থেকে বোঝা যায় উভয়ের এতটুকু মনের মিল নেই। একজনের গতি উত্তরে, অন্যের দক্ষিণে।

একজন আমুদে প্রকৃতির, আর একজন হয়ত' দার্শনিক। এরকম স্থলে সহবাস-জনিত ভালবাসা বিশেষ ভাবে গড়ে ওঠে না। কিন্তু তবুও ভালবাসা আছে। সেটা বোঝা যায় কোনো এক বিপদের দিনে। আর কতকগুলো ক্ষেত্রে মনের মিল আছে, কলহ বিবাদকে মান-অভিমানের পর্য্যায়ে ফেলা যায়।

তোমার সব কথা মেনে নিলেও আমার দু'একটা জায়গায় একটু গোলমাল হচ্চে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে রোগে চিকিৎসা করে না, উপযুক্ত আহার দেয় না, অযত্নে অবহেলায় তাকে মেরে ফেলে।

এ সমস্ত কু-শিক্ষার ফল। সমস্ত দোষগুলোই ভালবাসার অভাবের ওপরে চাপিয়ো না।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। প্রায় পনের মিনিট সময় অতিবাহিত হলে পর ডাক্তার একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু রাগ করে উঠো না।

সলিল প্রশ্নের আশায় ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে চাইলে।

ডাক্তার বল্লে, এখন আমি ত' তোমায় জিজ্ঞাসা

করতে পারি, তুমি এই মেয়েটিকে বউ বল্লে, অথচ তাকে বিয়ে করোনি!

সলিল গম্ভীর মুখেই বল্লে, পাছে তোমার অন্যরূপ ধারণা হয় সেই আশঙ্কা করেই আমি বউ বলে পরিচয় দিই, কিন্তু দেখ্‌লুম তাতেও তোমার মুখ বন্ধ করা গেল না।

ডাক্তার হটাৎ সলিলের হাত ধরে বল্লে, জানিস্ ত', আমি চিরকালই একটু বোকা। আমার এই দুর্ব্বিনীত আচরণের জন্যে তোর কাছে ক্ষমা চাইচি।

সলিলের সুমুখে বেশীক্ষণ বসে থাকৃতে ডাক্তারের লজ্জা বোধ করছিল। সে উঠ্‌তে চাইলে। কিন্তু সলিল তাকে না ছেড়ে একথা সে-কথা কইতে লাগ্‌ল। তার ভদ্রতা ও শিক্ষা আবহাওয়াটাকে ঠিক পূর্ব্বের ভাবে ফিরিয়ে আন্‌লে। কিছুক্ষণ পরে যখন উভয়েই চোখ মেলে চাইলে তখন দেখ্‌লে, রেখা উভয়েরই অজ্ঞাতসারে কখন বেরিয়ে গেছে!

ডাক্তার চলে যাবার পর রেখা ফিরে আস্‌তেই সলিল বল্লে, দেখ, এই সব বন্ধু দেখে তোমার নিশ্চয়ই আমার ওপরে সন্দেহ জাগ্‌চে।

স্মিতমুখে রেখা উত্তর দিলে; নিশ্চয়ই, তুমিত'

জগু। তোমাকে সন্দেহ না করলে কি আমার মুক্তি আছে !

তারপরে একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, আচ্ছা, তুমিত' আমার জন্যে কত অপমান সয়েচ, কত কষ্ট স্বীকার করেচ, কিন্তু আমি তোমার জন্যে কী করলুম বলত' ?

সলিল হেসে বল্লে, ভক্ত যখন দেবতাকে পেতে চায় তখন তাকে পাবার আগে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয় জান ত' ?

কিন্তু ভক্তের জন্যে বুঝি দেবতার প্রাণ কাঁদে না !

মোটে না, মোটে না, তুমি যে নিষ্ঠুর দেবতা।

আজ এই প্রথম্ সলিল রেখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথাগুলো বল্‌লে।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

হইতে প্রকাশিত

হইবে

পরে প্রকাশিতব্য